তবলার ইতিবৃত্ত

[সর্বভারতে মান্য সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম বর্ষ হতে ষষ্ঠ বর্ষ এবং তদোর্দ্ধ পাঠক্রম উপযোগী]

শম্ভু নাথ ঘোষ এম. এ. (ডবল), বি. টি., কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন,

সংগীত-বিশারদ (লক্ষ্ণৌ),

সংগীত-প্রভাকর (বাদ্য), এলাহাবাদ

অধ্যক্ষ : গীতিগুঞ্জ, কলিকাতা।

যাদবপুর সংগীত মহাবিদ্যালয়,

কলিকাতা।

প্রাক্তন ,, : শরৎচন্দ্র পাল গার্লস্ স্কুল

(ড্যান্স এণ্ড মিউজিক),

কলিকাতা।

,, অধ্যাপক : রামকৃষ্ণ মিউজিক কলেজ,

কলিকাতা।

,, ,, : পঃ নবদ্বীপ ব্রজবাসী সংগীত

মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা।

পরীক্ষক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়াগ সংগীত সমিতি,

এলাহাবাদ।

প্রাচীন কলাকেন্দ্র, চণ্ডীগড়।

●

গান্ধার প্রকাশনী

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

লিলি লজ, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশিকা :
অনিন্দিতা ঘোষ
১৬৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
লিলি লজ, কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
১৪, দুর্গা পিথুরী লেন,
কলিকাতা-১২

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর
শ্রীচরণে

॥ গ্রন্থ পরিচিতি ॥

সংগীতের নানা শাখা সম্বন্ধে বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় পুস্তকাদির অভাব নেই এবং এই বিষয়ে বোধ হয় কণ্ঠসংগীতের প্রাধান্যই সর্ব্বাধিক। বাদ্যযন্ত্রাদির বিষয়েও কিছু কিছু পুস্তক থাকলেও আনদ্ধ বা অবনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যের পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যের মধ্যে মৃদঙ্গ ও তবলাই বর্তমানে সমধিক প্রচলিত। এই দুইটি বাদ্যের মধ্যে আবার তবলার প্রাধান্য তথা জনপ্রিয়তা খুব বেশী। কারণ কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে গীত, বাদ্যে এবং নৃত্যে তবলা সঙ্গত অপরিহার্য। পাশ্চাত্য সংগীত অপেক্ষা ভারতীয় সংগীতে তালের জটিলতা অনেক বেশী একথা সকলেই স্বীকার করেন। তাই তবলার আবিষ্কার ভারতীয় সংগীতের অগ্রগতির পথে এক নতুন পদক্ষেপ। বর্তমানে পাশ্চাত্যের সংগীত জগতে ভারতের এই বিশেষ বাদ্যযন্ত্রটির প্রতি অবাক বিস্ময় ও ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্য।

বর্তমানে তবলার চর্চা ক্রমপ্রসারমান। তাছাড়া স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রমের মধ্যেও তবলা নিজের একটি আসন করে নিয়েছে। কোন জ্ঞানই সম্পূর্ণ হয় না যদি ক্রিয়াত্মক (Practical) অংশের সঙ্গে সেই বিষয়ের ঔপপত্তিক (Theory) অংশের সম্যক জ্ঞান না থাকে। তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় দুটিকেই সমান প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

সংগীত বিদ্যাটাই গুরুমুখী, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠে কিছু হয় না,—বিশেষ করে ক্রিয়াত্মক অংশ। তবে ঔপপত্তিক অংশে জ্ঞানলাভের জন্য পুস্তকাদির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এতদিন তবলার এই বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে এবং সত্যকারের কোন ভাল পুস্তকের অভাবই বোধ করেছি। "তবলার ইতিবৃত্ত" সেই অভাব বহুলাংশে পূরণ করবে বলে মনে করি। মোটামুটি তবলা সংক্রান্ত সকল বিষয়ই পুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে এবং আলোচনাগুলিও সাবলীল ও যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ হয়েছে। তবলা শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানান্বেষী সকলেই এই পুস্তকপাঠে সবিশেষ উপকৃত হবেন।

১৬৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ নিবেদন ॥

আমার সংগীত জীবনের উষালগ্নে তবলা নিয়েই প্রথম পদ চারণা। তাই তবলা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান আহরণের সচেষ্ট প্রয়াসের ফলশ্রুতি স্বরূপ 'তবলার ইতিবৃত্তে'র কুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ। প্রধানতঃ সকল সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়কে একদিকে যেমন যথাসম্ভব তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে অপরদিকে তেমনই তবলা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই অশীতিপর বয়স্ক জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীকেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংগীত-কোবিদ ডাঃ বিমল রায়ের নাম সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করতে হয়। 'পুস্তক পরিচিতি'' লিখে দেওয়া ব্যতীত নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটিকে ত্রুটীমুক্ত করতে কেশববাবু সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ঘরাণার উদাহরণগুলিও তাঁর উদার দাক্ষিণ্যের নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল। ডাঃ রায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ''পখাবজ ও তবলার বিকাশ''' গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে অন্যান্য যাঁরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হচ্ছেন কোলকাতার সম্ভ্রান্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী মেসার্স এস. চন্দ্র এণ্ড কোং—এর স্বত্বাধিকারী শ্রীএস. চন্দ্র, এবং শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ-কাব্যরত্ন।

সূচীপত্র

তবলার ইতিবৃত্ত

প্রথম অধ্যায়

॥ পখাবজ ও তবলার বিকাশ ॥

ডাঃ বিমল রায়, এম. বি.

(প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতে পখাবজ ও তবলার নাম নেই। অথচ প্রচলিত মতে পখাবজ ও মৃদঙ্গে কোন পার্থক্য স্বীকার করা যায় না, যদিও তবলা ব্যাপারে নানা মত-বিভিন্নতা বর্তমান। আধুনিক গবেষণামুখী মন—কিন্তু ঐ দায়বিহীন মন্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেনা; সে বস্তুনিষ্ঠ হতে চায়। সেই বস্তুনিষ্ঠাই পখাবজ-কে মৃদঙ্গ থেকে পৃথক্ করে তোলে, তবলার ব্যাপারে একটি মতকে গ্রহণ করে।)

(পৌরাণিক যুগে মৃদঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়, বৈদিক যুগে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই মৃদঙ্গের আকৃতি সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা পুরাণে নেই।) আকৃতি ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান হলো নাট্যশাস্ত্রের ভরতের কালে। সে-সময়ের মৃদঙ্গ তিনটির মধ্যে যেটি ক্রোড়ে স্থাপন করে বাজানো হতো, সেটি হরিতকী আকৃতির, অর্থাৎ অনেকটা আধুনিক পখাবজের মতো দেখতে ছিল। কিন্তু সেই মৃদঙ্গে গাব দেওয়া হতো না, এমন কি মাটির প্রলেপ দেওয়া হতো কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। মৃত্তিকানির্মিত এই মৃদঙ্গ ভরতমুনির সময়ে আঙ্কিক নাম ধারণ করে এবং স্বাতীর প্রভাবে কালোমাটীর গাব যুক্ত হয়ে ও ছোটের টানের বাড়াকমার ব্যবস্থা যুক্ত হয়ে সেই আঙ্কিক সপ্তকের স্বর অনুসরণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। (স্বরানু-করণের এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে স্বাতি মৃদঙ্গে তিনটি প্রকারের নাম-করণ করেন ত্রিপুষ্কর বা পুষ্করত্রয়। শার্ঙ্গদেবের সময়ে পুষ্কর নামটি লোপ পায়, মৃদঙ্গ নাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মর্দল শব্দটি মৃদঙ্গের

সমর্থক রূপে প্রচলিত হয়।) মুরজ বাদ্যটিও তার রূপ পরিবর্তন করে মৃদঙ্গবিশেষ হয়ে পড়ে। কিন্তু পুষ্করত্রয়ের উধ্বক, আলিঙ্গ্য লুপ্ত হয়ে যায় নিঃশেষে, কাজেই মৃদঙ্গ বলতে এ সময়ে আঙ্কিক বাদ্যকেই বোঝায়। পার্থক্য এইটুকু হয় যে, আঙ্কিকের মুখদুটি যেখানে ১২ আঙ্গুল, সেখানে মর্দলের দুমুখ ১৩ এবং ১৪ আঙ্গুল। ঐ দুমুখের বাঁ মুখে গাব লাগানো হতো বেশী করে। তা ছাড়া, মর্দলে ছোটের সঙ্গে দড়ির রিং থাকতো, যার সাহায্যে স্বর চড়ানো নামানো যেতো; আজকাল রিং-এর বদলে কাঠের গুলি হয়েছে। অন্য পার্থক্য হলো, পুষ্কর ছিল মাটীর তৈরী, মর্দলের দেহ ছিল কাঠের। এই মর্দল বা মৃদঙ্গের নাম পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে এ নাম খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও আকৃতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ কোথাও স্পষ্ট ভাবে মেলে না। অথচ মুসলিম প্রভাবিত অভিজাত সঙ্গীতে মৃদঙ্গ নামের পরিবর্তে পখাবজ নামটির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এই পখাবজ শব্দটির উদ্ভব নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। কিন্তু জৈন সুধীকলশ সে কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন। সুধীকলশ বাচনাচার্য্য ১৪শ শতকের মধ্যকাল থেকে ১৫শ শতকের প্রথম চতুর্থাংশ কালের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। এই জৈন পণ্ডিত ছিলেন অভয় চন্দ্র সূরির শিষ্য পরম্পরাগত সঙ্গীত-জ্ঞানী এবং সেই সূত্রে পার্শ্বদেবের কৌলিন্যে বর্ধিত। "সঙ্গীতোপ-নিষৎসারোদ্ধার" নামক গ্রন্থ এই সুধাকলশ কর্তৃক রচিত একখানি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক, যা প্রাচীন জৈন মতের ধারক, এবং সম্পূর্ণ-রূপে বিদেশীয় প্রভাবমুক্ত।

গ্রন্থখানি কয়েকবৎসর পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে অতএব সাধারণের পক্ষে সহজ-লভ্য। এই গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় সুধাকলশ কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন :—

"আউজ্বা লোকভাষায়াং থন্দাউজ-পখাউজো
মতাঃ পট্টাউজশ্চেতি স্ব-স্ব-নামানুসারিণঃ।
তথৈব ম্লেচ্ছবাদ্যানি ঢোল্ল তব্‌মুখানি তু
ডফা চ টামকীচৈব ডউণ্ডিঃ পাদচারিণাম্‌......"

এই একমাত্র জ্ঞানী যিনি জানিয়েছেন, তাঁর সময়ে বা তার আগে থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে পখাউজ ও তব্‌ল ব্যবহৃত হতো। পখাউজ পখ-আব্‌জের লোকভাষা এবং তব্‌ল একটি ম্লেচ্ছবাদ্য।

আবজ ভারতীয় প্রাচীনবাদ্য। সঙ্গীত রত্নাকরে আছে :—

১। "দেশীপটহম্ এবাহুর্ ইমম্ অড্ডাবজং জনাঃ" ৬/৮২৪

২। হুড়ুক্কা সা বুধৈঃ প্রোক্তা......৬/১০৭৪

লক্ষ্যজ্ঞাস্ত্বাবজং প্রাহুর্ ইমাং স্কন্ধাব্‌জং তথা" ৬/১০৭৭

অর্থাৎ শার্ঙ্গদেবের সময়ে আব্‌জ (হুড়ুক্কা) স্কন্ধাব্‌জ (হুড়ুক্কা), অড্ডাব্‌জ (দেশী পটহ) বাদ্যের নাম ও ব্যবহার পাওয়া যায়। কিছুকালের মধ্যেই দেশী উচ্চারণে এগুলি হয়ে পড়ে আউজ, খন্দাউজ, পট্টাউজ [অড্ড শব্দটি উত্তর ভারতে পট বা আড়া এবং দক্ষিণ-ভারতে আটরূপে বিবর্তিত হয়েছিল। প্রমাণ—অড্ডতাল=পটতাল ও অটতাল]। সেই সময় পখাউজ নামে একটি নূতন বাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

মনে হয়, পখাউজ শব্দটি এসেছিল পুষ্করাব্‌জ থেকে [পুষ্কর= পুখ্‌খর্; পুখ্‌খর+আব্‌জ পুখ্‌খরাব্‌জ=পুখ্‌খাব্‌জ=পখাবজ=পখাউজ]। পুষ্কর ও আব্‌জ দুটি পৃথক্ শ্রেণীর বাদ্য। পুষ্কর মৃদঙ্গ শ্রেণীর বাদ্য যার চর্মাবরণে খিরণ লাগানো হতো, যে জন্য পুষ্করে সপ্তকের স্বর উৎপাদন সম্ভব ছিল। তার আকৃতিও ছিল আধুনিক পখাব্‌জের মতো এবং বাম মুখ দক্ষিণ মুখ অপেক্ষা সামান্য বড় বা সমান ছিল। অপরপক্ষে আব্‌জ আকৃতিতে ছিল অনেকাংশে ঢোলের মতো, চর্মাবরণে গাব দেওয়া ছিল না এবং দক্ষিণ মুখ বাম মুখের সমান বা তুলনায় সামান্য বড় ছিল।

পুষ্কর হাতে বাজানো হতো, আব্‌জ বাজতো দণ্ড-সাহায্যে বা দণ্ড ও হাতের মিলিত ব্যবহারে। অনুমান করা যায়, ১৪শ শতকে কোন গুণী আব্‌জকে পুষ্কর আকৃতি করে পখাব্‌জ সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে বাদ্যটির মধ্যদেশ কিছু স্থূল হয়েছিল, দক্ষিণ-মুখ বাম মুখের চেয়ে ছোট হয়েছিল কিন্তু যার চর্মাবরণ ও বাদন পদ্ধতি আব্‌জের অনুরূপ রাখা হয়েছিল। অতঃপর বিবর্তনের প্রভাবে পখাবজে গাবের প্রচলন হয় এব হস্ত বাদন পদ্ধতি গৃহীত হয়।

এ সময়ে তবলা গীতবাদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বোধ হয়, ঐ তবলার অনুকরণে পখাব্জে খিরণ বা গাবের আধুনিক প্রকৃতির অনুলেপন শুরু হয়—ডান মুখে পুরু গাব ব্যবহার করা হয়, বাঁ মুখে সাদা থাকে।

মনে হয় পখাব্জের অনুকরণে একদিন পুষ্কর বা মৃদঙ্গও আকৃতি প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে পখাব্জের সমর্থক হয়ে পড়ে এবং শেষে পখাব্জ মৃদঙ্গেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিবর্তনটি হয়েছিল উত্তর ভারতে, কারণ তব্লা উত্তর ভারতেই প্রচারিত ছিল, দক্ষিণ ভারতে নয়। তাই দক্ষিণে আজও মদ'লম্ বাজে, পখাব্জ চলে না।

পখাব্জের নামের সঙ্গে তবলা এমন ভাবে জড়িত, যে, তব্লার ইতিহাস না জানলে পখাব্জ সম্বন্ধে জ্ঞান খণ্ডিত হয়ে পড়বে। তবলা না থাকলে আব্জের বৃহত্তর দক্ষিণ মুখ ছোট হতো না এবং পুষ্করের বাম মুখের পুরু গাব উঠে গিয়ে দক্ষিণ মুখের পাত্লা গাব পুরু প্রলেপ পেয়ে বিস্তৃত হয়ে শব্দে বিচিত্রতা আনতে পারতো না।

সুধাকলশ বলেছেন তব্ল অর্থাৎ তব্লা ম্লেচ্ছ-বাদ্য। ১৪শ খ্রীষ্টাব্দে ম্লেচ্ছ বলতে মুসলিমদের বোঝাতো, সুতরাং তব্লা মুসলিমদের দ্বারাই ভারতে আনিত হয়েছিল। কিন্তু এ আনয়নের কোন ঐতিহাসিক বা লিপিবদ্ধ প্রমাণ নেই। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রমাণ বহু কারণে লোপ পেতে পারে। এমনও হতে পারে, তবলা খ্যাল—গজলের সঙ্গে বাজানো হতো বলে ভারতীয়রা এ বাদ্যকে আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেন নি। সে যাইহোক্, 'সঙ্গীতোপনিষৎসার' অন্তত এটুকু প্রমাণ করেছে যে, তবলা ১৪শ খ্রীষ্টাব্দের আগে থেকেই এ-দেশে আছে। নামটির মধ্যেই আরবদেশীয় ঐতিহ্য সপ্রমাণ হয়ে রয়েছে। অধিকন্তু, তবলা বাঁয়ার মতো কোনও বাদ্য আমাদের দেশে ছিল না। ভরতকালীন উর্ধ্বক ছিল যবাকৃতি, বামক, দক্ষিণ ছিল আঙ্কিক মৃদঙ্গের দুটি মুখ; দর্দুর ছিল ঘণ্টাকৃতি যার মুখ ছিল ঘটের মতো। ১২শ শতকে এরা ব্যবহৃত হতো এমন প্রমাণও কোথাও নেই। অথচ আরবীয় বাদ্য যে ৬শ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই জোড়ায়-জোড়ায় বাজানো হতো তার প্রমাণ মেলে পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি থেকে।

আরবদেশে চর্মবাদ্য বলতে নক্কারাকেও যেমন বোঝাত, তেমন বোঝাতো তবলকে। এই দুটি বাদ্য বিভিন্ন সময়ে ইয়ুরোপে গিয়েছিল কিছুটা গঠনমূলক পার্থক্য নিয়ে এবং নাম পেয়েছিল যথাক্রমে নকেয়ার্স্‌ ও তিম্ব্যাল্‌। ইতালীতে তিম্ব্যাল্‌কে বলা হতো ত্তিম্পানি। ত্তিম্পানির যে ছবি আমরা মিউজিক্যাল্‌ ইন্‌স্ট্রুমেন্ট্‌স্‌ থ্রু দি এজেস্‌ গ্রন্থের ১৯২ পৃষ্ঠায় দেখি, তা থেকে স্পষ্ট ধারণা হয়, আরবীয় তবল্‌ বলতে এক জোড়া ছোট-বড় বাঁয়াকে বোঝাতো, যারা দাঁড় করানো, যাদের একটিই মুখ—যে মুখ চর্মের আবরণ দেওয়া; এই চর্মকে টেনে বেঁধে বিভিন্ন স্বর বহির্গত করবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এতে খিরণ ব্যবহার বোধ হয় ছিল না। তাবর নামক আর একটি বাদ্য ১৩শ শতকে পশ্চিম ভূখণ্ডে পৌঁছেছিল, যার আকৃতি ছিল তবলার ডাহিনাটির ছোট সংস্করণ। নক্কারার বড় আকার যে-দুটি সে দুটির আকৃতি ডিমের মতো ছিল।

এই সব আকৃতির বিবর্তনের কথা চিন্তা করলে ১২শ খ্রীষ্টাব্দের তবলা-বাঁয়াকে আধুনিক তবলা-বাঁয়ার পূর্বতন রূপ বলে ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না।

আরবীয় এই তবল্‌ যেমন ১৩শ শতকে পশ্চিম গোলার্ধে পৌঁছিয়েছিল তেমন প্রায় সমসময়ে আরবীয় বিজেতাদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল, এ ধারণা বোধহয় মিথ্যা নয়। সঙ্গীতোপনিষৎসার খুব সম্ভব এই ইঙ্গিতই দেয়। কিন্তু নক্কারা, তবল্‌, খোরদক্‌ প্রভৃতিতে গাব ছিল না, সুতরাং তবলার একটি বিরাট বিবর্তন ঘটেছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ১৪শ শতকে পখাব্‌জ প্রচলিত আছে, অতএব মৃদঙ্গের খিরণ প্রয়োগ ঐ যন্ত্রে দেখা দিয়েছে। তবলার ডাইনার খিরণ অনুকরণ করতে গেলে মেনে নিতে হয় যে, ১৪শ শতকের মধ্যেই তবলায় গাবের ব্যবহার এসেছিল। গাবহীন ঢোল তখন প্রচলিত যা ঢকের স্থান গ্রহণ করছে, অথচ গজল, কৌল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতের উপযুক্ত মৃদুধ্বনিযুক্ত বাদ্য নেই। এই অভাব মেটাবার জন্যই তবলে মৃদঙ্গের খিরণ দেওয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু তবলার ডাহিনাটি বড় এবং যে-কোন কারণেই হোক্‌ প্রধান হওয়ার জন্য ধ্বনি উৎপাদন ব্যাপারে

তার বৈচিত্র্য বোধহয় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল এবং সেইজন্তই এমনভাবে খিরণ লেপন করা হয়েছিল যাতে ধ্বনিটি সূক্ষ্ম, মধুর অনুরণনযুক্ত হয়। এই কারণেই ডাহিনার গাব ছিল পুরু, বিস্তৃত, যার ফলে লব বা ময়দান অংশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। বাঁয়ার প্রলেপটি খুবই পাত্‌লা পুড়ীর মধ্যস্থলে না হয়ে কিনারার দিকে সরানো। প্রলেপের এই বৈশিষ্ট্য মৃদঙ্গে ছিল না, পখাবজে আজও নেই। বাঁয়ার ধ্বনি বৈচিত্র্য পখাবজের বাঁ মুখ থেকে সৃষ্টি করা অসম্ভব।

এই বিচিত্র তবলা তখনই প্রাধান্য লাভ করেছিল যখন গজল, খ্যাল দরবারে ভাল ভাবে স্থান পেয়েছিল। সে ব্যাপার ঘটেছিল ১৮শ শতকে। কিন্তু ১৫শ শতকেও কবীরের সময়ে তবলা বোধহয় সাধারণ গানের সঙ্গে বাজতো। একটি গান আছে, যাতে তবলা নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় স্পষ্টভাবে,—

"সারঙ্গ জলতরঙ্গ ধুনিধারী
তব্‌লা চঙ্গ ওর নরসিংহা ডফারী।
ইহি বিধি ভোর গুফা ধুনি গাজৈ
নানা রঙ্গ মধুর ধুনি বাজৈ"॥

গাব
লব
কানি
গজরা
কুড়ী
গুড়রী
বাঁয়া
গাব
লব
কানি
গজরা
কাঠ
গুলি
গুড়রী
তবলা

পখাবজ
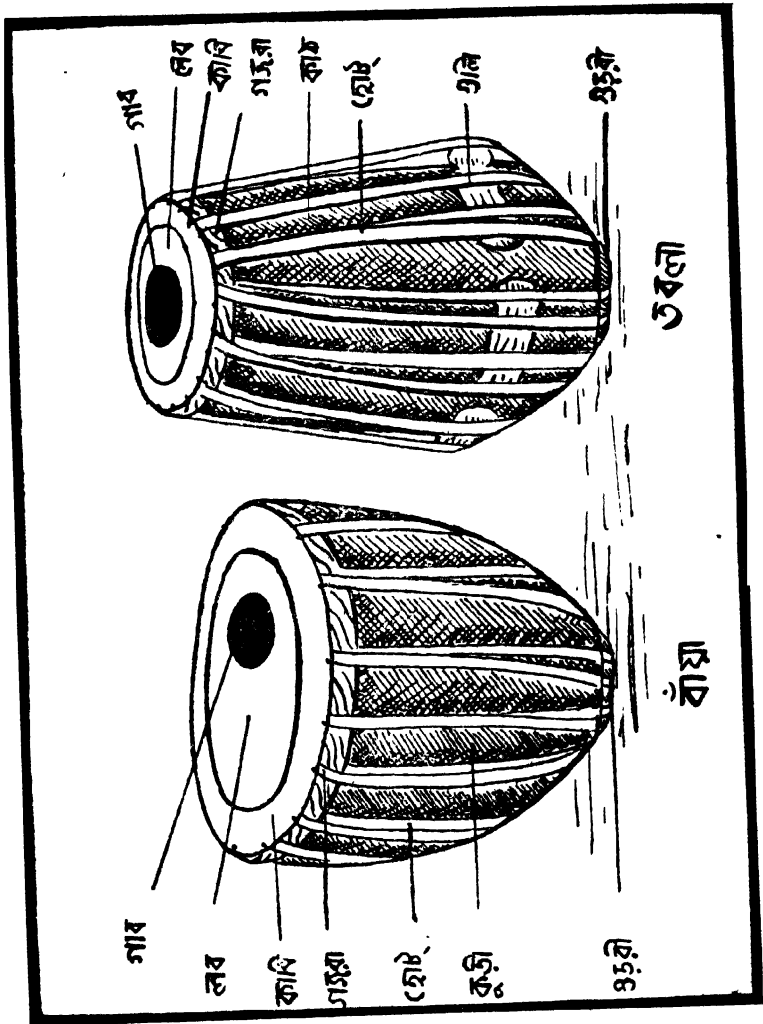
॥ তবলা, বাঁয়া ও পখাবজের অঙ্গ বর্ণনা ॥

তবলা এবং বাঁয়ার নানা অংশ আছে এবং সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ডান হাতে বাজান হয় বলে তবলাকে অনেকে 'ডাহিনা' বলে থাকেন এবং বাঁয়াকে বলা হয় 'ডুগী'। নিম্নে তবলা, বাঁয়া এবং পখাবজের বিভিন্ন অঙ্গের পরিচয় দেওয়া হল।—

॥ তবলার অঙ্গ ॥

(১) লকড়ী বা কাঠ—তবলার মূল কাষ্ঠনির্মিত সমগ্র অংশটিকেই বলা হয় লকড়ী বা কাঠ। এই অংশটি নির্মাণে নানা জাতের কাঠ ব্যবহার করতে দেখা যায়, যেমন—নিম, চন্দন, বিজয়শাল, আম, কাঁঠাল, সীসম প্রভৃতি। এই অংশটির নিম্নভাগ এবং উপরিভাগ গোলাকৃতি; তবে নিম্নভাগটি উপরিভাগ হতে চওড়া হয়। নিম্নভাগের ব্যাস হয় সাধারণতঃ ৮"/৯" ইঞ্চি এবং উপরিভাগের ব্যাস হয় ৫"/৬" ইঞ্চি এই কাঠটির উচ্চতা হয় ৯" হতে ১২" ইঞ্চি পর্যন্ত। কাষ্ঠাংশের মধ্যস্থল ফাঁপা থাকে।

(২) পুড়ীবা ছাউনি—কাঠের উপরস্থ চর্মাচ্ছাদিত গোলাকার অংশটির নাম পুড়ী বা ছাউনি। অংশটি নির্মাণে ছাগ বা মেষ চর্ম ব্যবহার করা হয়। পুড়ী বা ছাউনিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা: (ক) স্যাহী বা গাব, (খ) কানি বা চাঁটি এবং (গ) লব, সুর বা ময়দান।

(ক) স্যাহী বা গাব—চর্মাচ্ছাদিত অংশের ঠিক মধ্যস্থলে কাল রঙের গোলাকার অংশটিকে বলা হয় স্যাহী বা গাব।

(খ) কানি বা চাঁটি—ছাউনির কিনারা সংলগ্ন আধ ইঞ্চি মত বৃত্তাকার চর্মটিকে বলা হয় কানি বা চাঁটি।

(গ) লব, সুর বা ময়দান—গাব এবং কানির মধ্যবর্তী অংশ টির নাম লব, সুর বা ময়দান।

(৩) গজরা বা পাগড়ী—১৬টি ছিদ্রযুক্ত চামড়ার যে মোটা অংশটি ছাউনিকে ঘিরে রাখে তাকে বলা হয় গজরা বা পাগড়ী।

(৪) গুড়রী—কাঠের নিম্নাংশে চর্মনির্মিত গোলাকৃতি বস্তুটিকেই বলা হয় ইণ্ডবী বা গুড়রী।

(৫) ছোট্, বদ্ধি বা ডোরী—ছাউনিকে শক্ত বাঁধনে বাঁধবার জন্য গজরা থেকে গুড়রী পর্যন্ত চর্মরজ্জুকে বলা হয় ছোট্, বদ্ধি বা ডোরী।

(৬) গুলি বা গট্টা—ছোটের নীচে কাঠের উপর যে ছোট ছোট আটটি কাঠের টুকরা থাকে সেইগুলিকে বলা হয় গুলি বা গট্টা।

॥ বাঁয়ার অঙ্গ ॥

তামা, পিতল অথবা মাটি দিয়ে বাঁয়ার অবয়ব তৈরী হয় এবং তাকে বলা হয় হাঁড়ি বা কুড়ী। বর্তমানে মাটির বাঁয়ার প্রচলনই বেশী। বাঁয়ার উচ্চতা হয় সাধারণতঃ ৮½/৯½ ইঞ্চি এবং এর নিম্নভাগ হতে উপরিভাগের আয়তন বেশী। উপরিভাগের ব্যাস সাধারণতঃ ১০/১২ ইঞ্চির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাঁয়ার ভিতরের অংশটি সম্পূর্ণ ফাঁপা থাকে।

তবলার মত বাঁয়ারও ভিন্ন অংশ আছে, যেমন—কুড়ী, পুড়ী, চাঁটী, গজরা, গাব বা স্যাহী, লব বা ময়দান, ছোট্, গুড়রী ইত্যাদি। বাঁয়ার গুলি বা গট্টা নেই। তবলার বর্ণিত অঙ্গগুলির মতই বাঁয়ার এই অঙ্গগুলি বলে আর পুনরুক্তি করা হল না। তবে তবলার সঙ্গে বাঁয়ার অঙ্গের নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখ্য :—

(ক) তবলার গাব বা স্যাহী থাকে ছাউনির ঠিক মধ্যস্থলে। কিন্তু বাঁয়ার থাকে কিনারার দিকে।

(খ) তবলার গাবের অংশটুকু বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ এর উপর নানা প্রকার বোল বাজান হয়ে থাকে, কিন্তু বাঁয়ার গাবের উপর কোন বোল বাজান হয় না।

(গ) তবলার গাবের অংশ বাঁয়ার থেকে বড় হয়।

॥ পখাবজের অঙ্গ বর্ণনা ॥

আকৃতি—তবলা এবং বাঁয়ার সংযুক্ত রূপের মতই অনেকটা পখাবজ বা মৃদঙ্গের আকৃতি। কাঠামোটি রক্তচন্দন, নিম, কাঁঠাল,

খদির ইত্যাদি নানা জাতের কাঠ দিয়ে তৈরী হয়। তবে খদির এবং রক্তচন্দন কাঠের পখাবজই উত্তম বলে সর্বজন স্বীকৃত। তবলার মত অংশে তবলার মতই পখাবজের পুড়ী, গাব, কানি, লব, গজরা, ছোট্, গুলি প্রভৃতি অংশ আছে। পখাবজ লম্বায় সাধারণতঃ ১'৯" হতে ২' ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর ডানদিকের মুখের পরিধি হয় ৬½" বা ৭" ইঞ্চি, বামদিকের মুখের পরিধি ৭½" বা ৮" ইঞ্চি এবং মধ্যস্থলের ব্যাস হয় ৯"/১০" ইঞ্চি।

ছাউনি—পখাবজের উভয় প্রান্তই চর্মাচ্ছাদিত। বাঁয়ার মত অংশে অর্থাৎ বাম দিকের অংশের উপর বাজাবার পূর্বে বেশ পুরু করে আটা বা ময়দা লাগিয়ে নেওয়া হয়। মৃদঙ্গের আওয়াজকে প্রয়োজন মত গুরু গম্ভীর করবার জন্য আটা বা ময়দা ব্যবহার করা হয়।

ছোট্ বা বদ্ধী—দুইপ্রান্তস্থ ছাউনিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখবার জন্য যে চর্মরজ্জু ব্যবহার করা হয় তাকেই বলা হয় ছোট্ বা বদ্ধী।

গজরা—ছাউনির নিম্নে চর্মনির্মিত পাগড়ীর মত গোলাকার বস্তুটির নাম গজরা। এই গজরার সঙ্গেই ছোট্‌কে সংযুক্ত করা হয়।

গুলি—ছোটের নিম্নস্থ ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ডের নাম গুলি। গুলির সংখ্যা থাকে আটটি।

॥ তবলা ও মৃদঙ্গের তুলনা ॥

তবলা এবং মৃদঙ্গ দুইই অবনদ্ধ বা আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্য হলেও দুটি বাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমনঃ

(১) তবলার অনেক পূর্বে মৃদঙ্গের উদ্ভব হয়েছে এবং পরবর্তীকালে মৃদঙ্গকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আমীর খুস্‌রো তবলার উদ্ভাবন করেন বলে প্রবাদ আছে।

(২) তবলা এবং মৃদঙ্গের গঠন প্রণালী আকৃতিতে কোনও মিল নেই। তবলা ও বাঁয়া—পৃথক অংশ, কিন্তু মৃদঙ্গের কোনও পৃথক অংশ নেই।

(৩) মৃদঙ্গের ধ্বনি তবলার তুলনায় অনেক গাম্ভীর্যপূর্ণ। তাই ধ্রুপদ, ধামার জাতীয় গানে তবলার পরিবর্তে মৃদঙ্গ উপযোগী।

(৪) দুইটি বাদ্যযন্ত্রের বাজাবার মধ্যেও পার্থক্য আছে; তবলা বাঁয়া বাজাবার সময় উর্দ্ধমুখী থাকে, কিন্তু মৃদঙ্গ শায়িতবস্থায় রাখতে হয় এবং এর মুখ দুইটি থাকে পার্শ্বে।

(৫) তবলা ও মৃদঙ্গের বোল বা বাণীর মধ্যে পার্থক্য আছে। এবং দুইটি বাদ্যযন্ত্রের বাদন-শৈলীও এক প্রকার নয়। তবলার বোল-গুলি বাজান হয় দুই হস্তের অঙ্গুলীর সহায়তায়, কিন্তু মৃদঙ্গ বাজাতে হাতের পাঞ্জা ব্যবহার করা হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উভয় যন্ত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়।

(৬) বর্তমান কালে তবলা মিলান হয় মধ্য সপ্তকের পঞ্চম বা তার ষড়জে; কিন্তু মৃদঙ্গের সুর মিলান হয় মন্দ্র ষড়জে।

(৭) ধ্রুপদ কিংবা ধ্রুপদাঙ্গের গান ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর সংগীতে সাধারণতঃ তবলা ব্যবহার করা হয়, তাই এর প্রচলন খুব বেশী। অন্যদিকে ধ্রুপদ কিংবা ধ্রুপদাঙ্গের গান বাজনাতেই কেবলমাত্র মৃদঙ্গের ব্যবহার হয়, তাই তবলার তুলনায় এই বাদ্যযন্ত্রটির প্রচলন অনেক কম।

(৮) মৃদঙ্গের বাম দিকের অংশে আটা বা ময়দা লাগান হয় আওয়াজকে গম্ভীর এবং সুমধুর করবার জন্য; কিন্তু বাঁয়াতে গাব লাগান থাকে, তাই এর আওয়াজ মৃদঙ্গের তুলনায় অনেক হাল্কা।

(৯) প্রয়োজন বোধে বর্তমানে মৃদঙ্গের কিছু তাল তবলায় পরি-বেশন করা হয়, কিন্তু তবলার পরিবর্তে মৃদঙ্গে তবলার গৎ পরিবেশিত হয় না।

(১০) দুইটি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলায় রেলা, পেশকার, কায়দা ইত্যাদির অধিক প্রচলন, কিন্তু মৃদঙ্গে গৎ, পরণ প্রভৃতির প্রচলন বেশী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ বর্ণ, বোল বা বাণী ॥

তবলা বা মৃদঙ্গের ভাষা বা অক্ষরকেই বলা হয় বর্ণ, বোল বা বাণী। বিদ্যার্জনে যেমন অক্ষর জ্ঞান অপরিহার্য, তবলা বা মৃদঙ্গ বাদনে সেই প্রকার বর্ণ-পরিচয় অপরিহার্য। বর্ণ দুই প্রকার: সরল বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণ। সরল বর্ণগুলি সাধারণতঃ বাজান হয় একহাতে এবং সংযুক্ত বর্ণগুলি বাজাবার সময় দুই হাতই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবলা ও মৃদঙ্গের বর্ণ সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশ গুণী তবলায় ১০টি এবং মৃদঙ্গে ৭টি বর্ণ স্বীকার করেন। যেমন:

॥ তবলার ১০টি বর্ণ ॥

দক্ষিণ হস্তের বর্ণ: (১) তা বা না
(২) তি বা তিন্
(৩) দিন্ বা থুন্
(৪) তু বা তুন্
(৫) তে বা তি
(৬) রে বা টে

বাম হস্তের বর্ণ: (৭) কে, কি, ক বা কৎ
(৮) ঘে বা গে

উভয় হস্তের বর্ণ: (৯) ধা
(১০) ধিন্

॥ মৃদঙ্গের ৭টি বর্ণ ॥

দক্ষিণ হস্তের বর্ণ: (১) তা
(২) তে

(৩) টে
(৪) না
(৫) দি
বাম হস্তের বর্ণ: (৬) ক
(৭) ঘ

উপরিউক্ত সরল বর্ণগুলির সমন্বয়ে সংযুক্ত বর্ণগুলি উৎপাদিত হয়।

॥ তবলার ১০টি বর্ণের প্রয়োগবিধি ॥

॥ দক্ষিণ হস্তের বর্ণ ॥

(১) তা বা না: তবলার মধ্যবর্তী অংশ গাবের কিনারায় অনামিকা রেখে তর্জনী দ্বারা কানিতে আঘাত করলে 'তা' বা 'না' ধ্বনি পাওয়া যায়।

(২) তি বা তিন্: তর্জনীর দ্বারা লবের উপর আঘাত করে তর্জনী উঠিয়ে না নিলে 'তি' এবং তর্জনী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে নিলে 'তিন্' ধ্বনি উৎপন্ন হবে।

(৩) দিন্ বা থুন্: তবলার গাবের উপর চারটি আঙ্গুল দ্বারা (তর্জনী; মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা) একত্রে আঘাত করে হাত উঠিয়ে নিলে 'দিন্' বা 'থুন্' পাওয়া যায়।

(৪) তু বা তুন্: গাবের কিনারায় তর্জনী দ্বারা আঘাত করলে 'তু' বা 'তুন্' ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

(৫) তে বা তি: গাবের মধ্যবর্তী স্থানে অনামিকা ও মধ্যমার সংযুক্ত আঘাতে 'তে' বা 'তি' ধ্বনি হয়।

(৬) রে বা টে: কেবলমাত্র তর্জনীর দ্বারা গাবের মধ্যবর্তী স্থানে আঘাত করে 'রে' বা 'টে' ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়।

॥ বাম হস্তের বর্ণ ॥

(৭) কে, কি, ক বা কৎ: ৫টি অঙ্গুলী একত্রিত করে বাঁয়ার গাবের সম্মুখ ভাগের উপর আঘাত করলে 'কে', 'কি', 'ক' বা 'কৎ' ধ্বনি পাওয়া যায়।

(৮) ঘে বা গে: মধ্যমা এবং তর্জনী একত্রিত করে গাবের সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ স্যাহী এবং চাটীর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানে আঘাত করলে 'ঘে' বা 'গে' ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

॥ উভয় হস্তের বর্ণ ॥

(৯) ধা: তবলার 'তা' এবং বাঁয়ার 'ঘে' বা 'গে' একত্রে বাজালে 'ধা' ধ্বনিটি পাওয়া যাবে।

(১০) ধিন্: তবলার 'তিন্' এবং বাঁয়ার 'ঘে' বা 'গে' বর্ণের সম্মিলিত আঘাতে 'ধিন্' ধ্বনিটি উৎপন্ন হয়।

॥ তবলায় সুর বাঁধার নিয়ম ॥

উত্তম তবলা বাদক হতে গেলে তাঁর সুরজ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কারণ গান অথবা বাজনার পূর্বে যথাযথ সুরে তবলা বেঁধে নিতে হয় এবং এখানে গরমিল হলে তবলা সঙ্গতই করা চলে না। তাই প্রত্যেক তবলা বাদককেই এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হয় এবং ক্রমশঃ অভ্যাস করে করে এই বিগ্যাটি আয়ত্ব করতে হয়।

সাধারণতঃ রাগানুযায়ী মধ্য সপ্তকের ষড়জ, মধ্যম, পঞ্চম অথবা তার ষড়জে তবলা বেঁধে নেওয়া হয়। আগেকার দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্য ষড়জে তবলা বেঁধে গানের সঙ্গে বাজান হত। কিন্তু বর্তমানে গান এবং বাজনা উভয়ক্ষেত্রেই তার ষড়জে তবলা বাঁধা হয়।

তবলায় সুর বাঁধতে দুটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ গুলিগুলিকে উপরে উঠান বা নীচে নামান এবং দ্বিতীয়তঃ হাতুড়ীর সাহায্যে তবলার গজরা বা পাগড়ীর উপরে বা নিম্নভাগ আঘাত করা। গুলিকে উপরে উঠালে তবলার সুর নেমে যায় এবং গুলিকে যত নীচে নামান যাবে তবলার সুরও চড়বে। সেইরকম পাগড়ী বা গজরার উপর দিকে হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করলে সুর উচু হবে এবং নিম্নে আঘাত করলে সুর নীচু হবে। এই নিয়মানুযায়ী প্রথমে তবলার গুলিসমূহকে প্রয়োজন মত উপরে নীচে নামিয়ে দিয়ে সুরের সামান্য হেরফের সংশোধন করবার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে পাগড়ী বা

গজরার উপরে বা নীচে আঘাত করা হয়। গজরার উপর হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করতে হয় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে; অর্থাৎ আঘাতটি ওজন-মাফিক না হলে সুর কিছুতেই মিলবে না। আঘাতের পরিমাপ সম্বন্ধে ধারণার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাই নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে তবলায় সুর মিলান কিছু সময় এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ হয়।

তবলায় সুর মিলান সঠিক হয়েছে কিনা বোঝবার জন্য সবগুলি ঘাটেই (তবলায় ঘাট বা ঘরের সংখ্যা ১৬টি কিন্তু ২টি ঘাটের মধ্যবর্তী স্থান ধরে অনেকের মতে ৮টি ঘাট) চাঁটি মেরে মেরে সুর শুনতে হয়। যদি সব ঘাটেই একই প্রকার সুর শোনা যায় তাহলে তখনই বোঝা যাবে যে সুর মিলান যথাযথ হয়েছে। তবলায় সুর মেলাবার জন্য সকলেই একই প্রকার পদ্ধতির অনুসরণ করেন না। কেউ কেউ প্রথমতঃ নির্দিষ্ট সুরে যে কোনও একটি ঘাট বেঁধে নিয়ে অন্যান্য ঘাটগুলি প্রথম ঘাটটির সঙ্গে মিলিয়ে নেন। আবার কেউ কেউ প্রথমে যে ঘাটটি মেলান, দ্বিতীয় পর্যায়ে মেলান তার বিপরীত ঘাটটি এবং এই পদ্ধতিতে চারটি ঘাট (১নং—৯নং ও ৫নং—১৩নং) বেঁধে তবলায় সুর মেলান। প্রথম ঘাটটিতে আঘাত করলে 'তিন'—করে যে ধ্বনি নির্গত হবে সেই ধ্বনি এবং বাঞ্ছিত ধ্বনির মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলে বুঝতে হবে তবলায় সুর বাঁধা সঠিক হয়েছে। আবার কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী একত্র করে তবলায় সজোরে আঘাত করলে একটি ধ্বনি উদ্ভূত হয় এবং যাকে বলা হয়—'থাপের তা'। এই বিশেষ ধ্বনিটি অর্থাৎ 'থাপের তা যদি কম্পিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তবলায় সুর মিলান যথাযথ হয়েছে।

॥ হস্ত সাধন প্রণালী ॥

সার্থক তবলা-বাদক হতে গেলে প্রথমেই হস্তসাধন প্রণালীর বিষয়ে অবহিত হতে হবে এবং এই হস্তসাধনে কোনও ত্রুটী কিংবা এই বিষয়ে যথেষ্ট রিয়াজ না করলে তবলা বাজানও ত্রুটীপূর্ণ হতে বাধ্য এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। তবে ঠিকমত হস্তচালনার জন্য বসবার ভঙ্গিমার উপর প্রথমে নজর দেওয়া প্রয়োজন; কারণ প্রথমেই এমনভাবে উপবেশন করতে হবে যাতে দুটি হাতই অবলীলাক্রমে ব্যবহার করা যায়। তবে এই উপবেশনের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। কেউ কেউ আসন-পিঁড়ি হয়ে বাজাতে বসেন, কেউ বা ডান অথবা বাম পা পিছন দিকে মুড়ে তবলা বাজিয়ে থাকেন। তাছাড়া বীরাসনের মত বসে অথবা ডান পা সামান্য এগিয়ে বা ছড়িয়ে দিয়েও বসতে দেখা যায়।

উপরি উক্ত যে কোনও বসবার একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলগুলি তবলার উপর এবং বাম হস্তটি বাঁয়ার উপর সহজ ভাবে রাখতে হবে। এর পর তবলার বর্ণগুলির যথাযথ প্রয়োগে অভ্যস্ত হতে হবে; অর্থাৎ এক বা একাধিক অঙ্গুলীর মধ্যে যেটি যে বর্ণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সেটিকে সেই বর্ণ বাজিয়ে বাজিয়ে তৈরী করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সঠিক ধ্বনি বের করতে চেষ্টা করতে হবে। স্পষ্ট উচ্চারণের মত বর্ণটির প্রয়োগও স্পষ্ট হওয়া চাই। ধীরে ধীরে অভ্যাস করতে করতে যখন হাতের জড়তা আর থাকে না এবং বর্ণ বা বোলগুলি স্পষ্ট বাজে ও হাতও চালু হয়ে যায় তখন ক্রমশঃ লয় বাড়িয়ে দ্রুতলয়ে সেগুলি অভ্যাস করলে বর্ণগুলি সড়্গড়্ হয়ে যায়। এইভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে হস্তসাধন পদ্ধতি অনুসরণ করলে পরবর্তী কঠিন চীজ্‌গুলি সহজতর হয়ে আসে।

হস্তসাধন পদ্ধতির কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হ'ল।—

(১) একটি বর্ণ সহযোগে :—

তে, রে, কে, টে, তা, ক, তা, ক ;

কে, টে, তা, ক, তে, রে, কে, টে ;

তে, টে, তে, টে, ধা, গ, তে, টে ;
ধে, রে, ধে, রে, ধে, টে, ধে, টে ।

(২) একটি এবং দুটি বর্ণের মিশ্রণে :—
ধা, ধিন্, ধাধা, ধিন্, না, তিন্, তাতা, তিন্ ;
ধুন্, না, কৎ, তা, ধেৎ, ধেৎ, ঘেঘে, তেটে ।

(৩) তিনটি বর্ণ সহযোগে :—
ধাতেটে, তাতেটে, তগেন, ধগেন ;
কতিট, ধাত্রক, নাতিট, দেঘিন ।

(৪) চারটি বর্ণ সহযোগে :—
ঘিড়নগ, কিড়নগ, ধুমকিট, নকধিন ;
তিটকত, কিটতক, নগতিট, গদগিন ইত্যাদি ।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ তবলার পারিভাষিক শব্দাবলী ॥

॥ তাল ॥

তল্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া) ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ' প্রত্যয় যোগে তাল শব্দটির উদ্ভব হয়েছে; অর্থাৎ গীত, বাদ্য, এবং নৃত্য যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে তাল শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকার শক্তিরুচ্যতে।
শিবশক্তি সমাযোগাত্তাল নামাভিধীয়তে॥" [ভরতকোষ]

অর্থাৎ 'ত'-কারে শঙ্কর বা শিব এবং 'ল'-কারে শক্তি, এই দুটি বর্ণের সংযোগে 'তাল' শব্দটির নামকরণ হয়েছে। অর্থাৎ হর-গৌরীর তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের আদ্যক্ষরদ্বয় নিয়ে তাল শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। 'সংগীত তরঙ্গ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"হর-গৌরী নৃত্য হইতে সৃষ্টি হইল তাল"।—

প্রকৃতপক্ষে সংগীতে তাল বলতে বোঝায় কাল পরিমাণ বিশেষ। গীত, বাদ্য বা নৃত্যের গতি তথা লয়ের স্থিতি নিরূপণ করাকেই বলা হয় তাল। বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ মাত্রাসমষ্টি সহযোগে তাল গঠিত হয় এবং তাল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন: প্রতি বিভাগে ৪টি করে মাত্রা নিয়ে ১৬ মাত্রার তালের নাম ত্রিতাল, পাঞ্জাবী, তিলোয়াড়া প্রভৃতি। প্রতি ভাগে ২টি করে মাত্রা নিয়ে ১২ মাত্রার তালের নাম একতাল বা চৌতাল, ২।৩ ছন্দের ১০ মাত্রার তালকে বলা হয় ঝাঁপতাল ইত্যাদি। গীত, বাদ্য বা নৃত্য কোন না কোন তালে নিবদ্ধ থাকবেই, তাই সংগীতে তাল একটি অপরিহার্য অঙ্গ অর্থাৎ এক কথায় তালকে সংগীতের প্রাণ বলা যায়।

।। মাত্রা ।।

মা+ত্র করণ বাচ্যে + আপ স্ত্রীং=মাত্রা। মাত্রা অর্থে পরিমাণ। অর্থাৎ তালকে যা পরিমাণ করে তাকেই বলা হয় মাত্রা, অথবা তালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগগুলিকে বলা যায় মাত্রা। উদাহরণ স্বরূপ ঘড়ির পেণ্ডুলামের প্রতিটি 'টক্-টক্' শব্দকে এক একটি মাত্রা আখ্যা দেওয়া যায়; কারণ এইভাবেই পেণ্ডুলাম দ্বারা ঘড়ির সময়ের পরিমাপ হচ্ছে। বিভিন্ন দ্রব্য পরিমাপ করবার জন্য যেমন মিটার, লিটার, গ্রাম ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, সংগীতেও সেইরূপ তার গতি বা লয়ের পরিমাপ করা হয় মাত্রার দ্বারা।

মার্গ তালে মাত্রা ব্যবহৃত হত তিন প্রকার, যথা: গুরু, লঘু ও প্লুত এবং দেশী তালে এই তিনটি ব্যতীত দ্রুত নামে আরও একটি মাত্রার বিভাগ প্রচলিত হয়। বিভিন্ন প্রকার মাত্রার সময়কাল নিয়ে মতভেদ আছে। প্রাচীন গ্রন্থকার কল্লিনাথের মতে তালের লঘু মাত্রা হবে পাঁচটি লঘু অক্ষর নিয়ে এবং এক অক্ষর নিয়ে হবে ছন্দের লঘুমাত্রা। কাঁরও কাঁরও মতে একটি লঘু মাত্রার সময়কাল ৬টি অক্ষর পর্যন্ত, কাঁরও মতে ৪ অক্ষর পর্যন্ত, আবার ৪ অক্ষরেরও কম সংখ্যক অক্ষরে অনেকে লঘু মাত্রার সময়কাল নির্দেশ করেছেন। কোনও কোনও প্রাচীন শাস্ত্রকার মাত্রার সময় নির্দ্ধারণের জন্য আবার পাখীর ডাকের সঙ্গে মাত্রাব সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যেমন নীলকণ্ঠ পাখীর ডাক ১টি লঘু মাত্রা, কাকের ডাক ২টি লঘু মাত্রা এবং ময়ূরের ডাককে ৩টি লঘু মাত্রার সমান বলা হয়েছে। তবে বর্তমানে ঘড়ির সময়ের এক সেকেণ্ড মুহূর্ত সময়কে একটি লঘু মাত্রার সময়কাল বলে মানা হয়।

বর্তমান ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে ছয় প্রকার মাত্রার প্রচলন আছে। যথা—লঘু, গুরু, দ্রুত, অনুদ্রুত, প্লুত এবং কাকপদ। নিম্নে এই ছয়টি প্রকারের মাত্রাসংখ্যা উল্লেখ করা হল।

লঘু = ১ মাত্রা

গুরু = ২ ,,

দ্রুত = $\frac{১}{২}$,,

অনুদ্রুত = $\frac{১}{৪}$,,

প্লুত = ৩ ,,

কাকপদ = ৪ ,,

॥ ঠেকা ॥

তবলার কতকগুলি বর্ণকে প্রয়োজনানুসারে ছন্দোবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট মাত্রা বিভাগ সহকারে সুসমঞ্জস লয়ে বাজনাকে বলা হয় ঠেকা। মাত্রা ছন্দ তথা বিভাগ অনুযায়ী ঠেকার প্রকারভেদ আছে এবং প্রত্যেক প্রকার ঠেকার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। ঠেকার মাত্রাসংখ্যা নানা প্রকারের হয় অর্থাৎ মোটামুটি ৪ হতে ২৮ পর্যন্ত হয়ে থাকে; তবে প্রচলিত ঠেকার প্রায় সবগুলিই ৪ হতে ১৬টি মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট মাত্রার একটি তাল বাজাতে হলে সেই তালের ঠেকা দিয়ে বাজনা আরম্ভ করা হয়। সেইজন্য তবলা বাদনে ঠেকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিম্নে ১০ মাত্রার একটি তালের ঠেকা দেওয়া হল।

॥ ঝাঁপতাল ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না
×		২			০		৩		

॥ তালি বা ভরী ॥

তালের বিভিন্ন বিভাগের যতিসমন্বিত প্রারম্ভিক মাত্রাকে হাতে

তালি দিয়ে সশব্দে প্রকাশ করাকে বলা হয় তালি বা ভরী। বিভিন্ন তালে তালির সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। কোন বিশেষ তালের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার জন্যই তালির ব্যবহার করা হয়। ঠেকার নিম্নে শূন্য (০) ব্যতীত '+' বা '×' চিহ্ন সহ সংখ্যাবাচক শব্দগুলি তালির নির্দেশক। যেমন—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তেটে	ধিন	ধিন	ধা
※				২				০				৩			

উপরি উক্ত বোলটি ত্রিতালের এবং এই তালে '×' চিহ্ন সহ দুটি সংখ্যা আছে ২ ও ৩। অতএব ত্রিতালে তালির সংখ্যা হবে তিনটি।

॥ খালি বা ফাঁক ॥

যতিহীন বিভাগগুলি যা হাতে তালি দিয়ে দেখান হয় না; সেইগুলিকে বলা হয় খালি বা ফাঁক। খালি বা ফাঁকের সময় দক্ষিণ হস্তটিকে ঈষৎ সামনের দিকে প্রসারিত করে দেখান হয়। তালে এক বা একাধিক ফাঁক থাকতে পারে এবং '০' চিহ্ন দ্বারা ফাঁকের অস্তিত্ব বোঝান হয়। যেমন,—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দেন্	তা	কৎ	তাগে	দেন্	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে
×		০		২		০		৩		৪	

উপরি উক্ত বোলটি চৌতালের এবং এর ৩ এবং ৭ নম্বরে চিহ্ন আছে; অতএব এই তালের খালি বা ফাঁক আছে দুইটি।—

॥ সম্ ॥

তালের প্রারম্ভিক স্থান অর্থাৎ যেখান হতে তালের যাত্রারম্ভ সেই বিশেষ স্থানটিকে বলা হয় সম্। সাধারণভাবে তালের প্রথম মাত্রাটিকেই সম্ বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সম্-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে গান বাজনায় সাধারণতঃ সমের স্থানে একটু জোর দেওয়া হয় এবং সমের স্থানটিতে থাকে কিছু বৈচিত্র যা শ্রোতাগণকে উল্লাসিত করে। বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা সমকে বোঝন হয়। যেমন, '+', '×', 'S'' ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মতান্তরে ৩টি তাল এবং ১টি ফাঁক সমন্বিত তালের ২য় তালের ১ম মাত্রায় 'সম্' ধরা হয়। যেমন,

১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
ধা	ধিন	ধিন	ধা	|	ধা	ধিন	ধিন	ধা	|	না	তিন	তিন	না
×				|	৩				|	০			

(২য় তাল)

	১৩	১৪	১৫	১৬
|	তেটে	ধিন	ধিন	ধা
|	১			

॥ ছন্দ বা বিভাগ ॥

কতকগুলি গতি সৌন্দর্যবিশিষ্ট পরিমিত মাত্রা সমন্বিত পদকে বলা হয় ছন্দ। তালে ছন্দের বৈশিষ্ট্য দেখান হয় তাকে নানাভাবে বিভক্ত করে এবং মাত্রাসমষ্টির এক একটি অংশকে বলা হয় 'বিভাগ', প্রত্যেকটি তালই ছন্দানুযায়ী একাধিক বিভাগ সমন্বিত। নিম্নে কয়েকটি তালের ছন্দ, বিভাগ এবং মাত্রাসমষ্টির উল্লেখ করা হল।—

তাল	ছন্দ	বিভাগ	মাত্রাসংখ্যা
দাদরা	৩।৩	২	৬
তীব্রা	৩।২।২	৩	৭
কাহারবা	৪।৪	২	৮
ঝাঁপতাল	২।৩।২।৩	৪	১০
ত্রিতাল	৪।৪।৪।৪	৪	১৬

॥ আবর্তন ॥

যে কোনও তালের বোল প্রথম মাত্রা থেকে সর্বশেষ পর্যন্ত বাজান হলে বলা হয় আবর্তন, আবর্ত বা আবৃত্তি। এইভাবে একবার বাজালে বলা হয় এক আবর্তন, দুইবার বাজালে দুই আবর্তন ইত্যাদি। তালের মোট মাত্রাসংখ্যার উপর নির্ভর করে এক একটি আবর্তনের সময়কাল।

॥ কায়দা ॥

কোন একটি নির্দিষ্ট তালের রূপ যথাযথ বজায় রেখে অর্থাৎ তালি, খালি ইত্যাদি অপরিবর্তিত রেখে ঠেকানুযায়ী কিছু অতিরিক্ত বর্ণসমষ্টির সংমিশ্রণগত প্রয়োগকে বলা হয় কায়দা। কায়দা সাধারণতঃ দুই হতে তিন আবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। ভরী এবং খালি—এই দুই ভাগে কায়দা পরিবেশিত হয়ে থাকে। হস্তসাধন এবং তবলায় একক বাদনে (Solo) কায়দার প্রয়োগ অনিবার্য এবং শ্রুতিমধুর।

॥ ত্রিতালের একটি কায়দা ॥

ধা	তেরে	কেটে	তাক	তু	না	কেটে	তাক
×				২			
তা	তেরে	কেটে	তাক	তু	না	কেটে	তাক
০				৩			

॥ পেশকার ॥

কায়দারই বিশেষ এক প্রকারকে বলা হয় পেশকার। তবে কায়দা বাজান হয় সমান লয়ে, কিন্তু পেশকার বাজান হয় দ্বিগুণ হতে আটগুণ লয়ে। তাছাড়া কায়দার তুলনায় পেশকারে থাকে অলঙ্কার বাহুল্য। কোন কোনও ঘরানার বাজে (দিল্লী, অজরাড়া) পেশকার দ্বারাই বাজনা আরম্ভ করা হয়। কারণ যে বিশেষ তাল বাদক পরিবেশন করবেন পেশকারেই তার আভাস দেওয়া হয়। পেশকারে ধিকড়, ধিনতা, ত্রেকে, ধাক্রান্, ক্রেধা ইত্যাদি বোল অধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ধিকড়	ধিনাগ	ধাক্রাণ	ধাতেটে	ধিকড়	ধিনাগ	ঘেনেনাক্	তা
×				২			
তিকড়	তিনাক	কেটেতাক	তেরেকেটে	ধিকড়	ধিনধা	ঘেড়েনাগ	ধা
				৩			

॥ পাল্টা ॥

কায়দার বিস্তার করাকেই বলা হয় পলট্ বা পাল্টা। পাল্টাতে কায়দার বর্ণগুলি নানাপ্রকারে উলটিয়ে পালটিয়ে বিস্তার করা হয় এবং কায়দার মতই পাল্টারও প্রথম ভাগকে ভরী এবং দ্বিতীয় ভাগকে খালি বলা হয়। পাল্টা বাজাবার সময় তালের বিভাগগুলি যথাযথ রাখতে হয়। যেমন—

—কায়দা—ত্রিতাল—

ধা গে তে টে	ধা ধা তু না	তা গে তে টে	ধা ধা তে টে
×	২	০	৩

॥ পাল্টা ॥

ধা গে তে টে	ধা ধা তু না	ধা গে তে টে	ধা ধা তু না
ধা গে তে টে	ধা ধা তু না	ধা ধা তু না	তা গে তে টে
তা গে তে টে	ধা ধা তে টে	তা গে তে টে	ধা ধা তে টে
তা গে তে টে	ধা ধা তে টে	ধা ধা তু না	ধা গে তে টে
×	২	০	৩

॥ উঠান ॥

নৃত্য অথবা একক বাদনের (Solo) প্রারম্ভে যে বোল বাজান হয় তাকে বলা হয় উঠান। সকল বাজেই উঠানের প্রয়োগ বিধি প্রচলিত থাকলেও, বিশেষ করে পূরব বাজেরই এটা বৈশিষ্ট্য। প্রথমে বরাবর লয়ে উঠান বাজিয়ে তারপর দ্রুত লয়ে অর্থাৎ দুগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি লয়ে বাজান হয়। নিম্নে একটি উঠানের উদাহরণ দেওয়া হল।—

উঠান-ত্রিতাল

কৎ তা ঘেঘে তেটে	কেড়েনাগ তেরেকেটে নাগতেরে কেটে
×	২
ধা — —তেরে নাগতেরে কেটেনাগ	ধা- —তেরে নাগতেরে কেটেনাগ
০	৩

॥ আবৃত্তি ।

তালের প্রথম মাত্রা হতে শেষ মাত্রা পর্যন্ত পরিক্রমাকে বলা হয় আবৃত্তি বা আবর্তন। এক একবার পরিক্রমায় এক একটি আবৃত্তি শেষ হয় এবং এইভাবে একটি তাল একাধিক বার আবৃত্তি হয়ে থাকে। যেমন—

॥ তীব্রা তালের এক আবৃত্তি ॥

ধি ধি না | ধি না | ধি না
× ২ ৩

॥ রেলা ॥

কায়দার অনুরূপ বর্ণগুলিকে চৌগুণ বা আটগুণ লয়ে বাজান হলে তাকে রেলা বলা হয়। রেলা বাজাতে হলে সবিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়, কারণ যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হাত না হলে দ্রুত লয়ে স্পষ্টভাবে রেলা বাজন সম্ভব নয়। বৃষ্টির ধারার মত রেলা অত্যন্ত শ্রুতি-সুখকর।—রেলা দুই প্রকার (১) কায়দা রেলা এবং (২) স্বতন্ত্র রেলা।

কায়দা রেলা—কায়দাতে যে বর্ণগুলির প্রয়োগ হয় সেই একই বর্ণসমষ্টি দ্বারা রেলা রচিত হলে তাকে বলা হয় কায়দা রেলা। অর্থাৎ কায়দা রেলার প্রকৃতি কতকটা কায়দার পাল্টার মত হয়।

স্বতন্ত্র রেলা—কায়দা নিরপেক্ষ পাখোয়াজের অনুরূপ বোল-সহযোগে যে রেলা গঠিত হয় তাকে বলা হয় স্বতন্ত্র রেলা। যেমন—

ধাতে টেধা ক্রেধা তেটে | ধাগে নেধা গেনে থুনা
× ২
তাতে টেধা ক্রেধা তেটে | ধাগে নেধা গেনে থুনা | ধা
১ ৩

॥ পরণ ॥

পাখোয়াজের বোলের অনুরূপ জোরাল বর্ণের সাহায্যে একাধিক

আবর্তনে যে বন্দিশ তবলায় বাজান হয় তাকে বলা হয় পরণ। পরণের প্রয়োগ এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে; কারণ পরণ মুখ্যতঃ পাখোয়াজে বাজান হয়। পূরব বাজেই তবলায় পরণের প্রয়োগআধিক্য দেখা যায়। একক বাদনেই বর্তমানে পরণের প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং সাধারণতঃ তিহাই সহ এগুলি রচিত হয়। পরণের আবার প্রকার ভেদ আছে; যেমন—গৎ পরণ, বোল পরণ, তাল পরণ এবং সাথ পরণ। তবে এই বিভিন্ন প্রকারের পরণ একমাত্র পাখোয়াজেই প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তবলায় যে পরণ বাজান হয়ে থাকে তাতে ধাগেতেটে, ক্রধাতেটে, তাগেতেটে, ধেৎ, ধেৎ, গদিঘেনে ইত্যাদি বর্ণ-সমূহের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

ধেটেধেটে ধাগেতেটে ক্রেধাতেটে ধাগেতেটে
×
ক্রেধা-তি তাগেতেটে ক্রেধাতেটে ধাগেতেটে
২
ধেৎ ধেৎ তেরেকেটেধেৎ ঘেঘেতেটে ধাগেতেটে
০
ধেৎতাগি—ন্নাধেৎ তাগি-ন্না ধেৎ ধেৎ | ধা
৩

॥ বোল ॥

তবলা বা মৃদঙ্গের বর্ণগুলির সুসম্বদ্ধ রূপের নাম 'বোল'। সুতরাং কায়দা, পেশকার, রেলা, পরণ ইত াদি সব কিছুকেই 'বোল' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।—

॥ টুকড়া ॥

বর্ণগুলির ছন্দোবদ্ধ সীমিত রচনাকেই বলা হয় টুকড়া। কায়দা পেশকার ইত্যাদির মত টুকড়ার বিস্তার হয় না। টুকড়াকে গীতের তান বা তন্ত্রবাদ্যে ব্যবহৃত তোড়ার অনুরূপ বলা চলে। তান বা

তোড়ার মত টুকড়া সাধারণতঃ খুব বড় হয় না এবং এগুলি প্রায়শই তিহাই দিয়ে শেষ করা হয়। গান বা বাজনায় তবলা সঙ্গতে চমৎকারিত্ব উৎপাদনের জন্য টুকড়াকে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে একটি টুকড়ার উদাহরণ দেওয়া হল।—

তাতি নতি তাতাতি নতিন | তাকেটে তাঘেনে তাঘেনে
০ ৩

তাঘেনে | ধা
×

॥ চক্রদার বোল ॥

তিহাই সংযুক্ত কোন রচনা চক্রাকারে কমপক্ষে তিন আবর্তন বাজাবার পর সমে এসে শেষ হলে তাকে বলা হয় চক্রদার বোল বা টুকড়া। চক্রদার বোলের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এর তিহাইয়ের প্রথম দুই অংশ সমে এসে না পড়লেও শেষাংশ যথারীতি সমে এসে পড়ে। যেমন—

ধাধিন ধাকেটে তাকেটেতা কেটেকেটে | ধুমাকেটে তাকেটেতা
× ২

কেটেকেটে তাকধুম

কেটেতাক গদিঘেনে ধা-ধাধিন | ধাকেটে তাকেটেতা কেটেকেটে
০ ৩

ধুমাকেটে

তাকেটেতা কেটেকেটে তাকধুম কেটেতাক | গদিঘেনে ধা—
× ২

ধাধিন ধাকেটে

তা কেটেটা কেটেকেটে ধুমাকেটে তাকেটেতা | কেটেকেটে
০ ৩

ধুমাকেটে কেটেতাক গদিঘেনে | ধা
×

॥ মুখড়া-মোহরা ॥

তিহাই-সমন্বিত বা তিহাই-রহিত অল্প সংখ্যক বর্ণ দ্বারা রচিত যে বোল গীত বা বাদ্যের ছন্দানুযায়ী সমে এসে শেষ হয় তাকে বলা হয় মুখড়া বা মোহরা। তবে অনেকে মুখড়া এবং মোহরাকে পৃথক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে মোহরা অপেক্ষা মুখড়ার বোল গাম্ভীর্যপূর্ণ অর্থাৎ মুখড়াকে এক প্রকারের ক্ষুদ্র টুকড়া বলা চলে। কিন্তু মোহরা মুখড়া অপেক্ষা হয় ক্ষুদ্রতর এবং সরল। তবে সাধারণভাবে এই দুটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। গীত বা বাদ্যে মুখড়া বা মোহরার প্রয়োগ হয়ে থাকে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।—

তেৎ তা তেটে তেটে | নাতি নাতি নাকতেটে তেরেকেটে | ধা
০ ৩ ×

॥ লগ্‌গী ॥

কাহারবা, দাদরা, পস্তো, রূপক ইত্যাদি ছোট তালে কায়দার মত ছন্দবৈচিত্র্য-সম্পন্ন যে বর্ণসমষ্টি প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় লগ্‌গী। কায়দা থেকে লগ্‌গী হয় আকারে ক্ষুদ্র, তবে কায়দার মত লগ্‌গীতেও বিস্তারের কাজ করা চলে। সাধারণতঃ গজল, ভজন, ঠুংরী ইত্যাদি গানে লগ্‌গী পরিবেশিত হয় এবং লগ্‌গীর প্রয়োগে তবলা সঙ্গত আরও শ্রুতিমধুর হয়। একটি লগ্‌গীর নমুনা—

ধাতি ধাধা তিনা কিনা | তাতি ধাধা ধিনা ধিনা
× ২

ধাতি ধাধা তিনা কিনা | তাতি ধাধা ধিনা ধিনা | ধা
০ ৩ ×

॥ লড়ী ॥

লগ্‌গী বা তার অংশ বিশেষকে দুগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি লয়ে বাজান হলে তাকে বলা হয় লড়ী। লগ্‌গী বাজাবার পরে লড়ী

বাজান হয় তবলা বাদনকে আরও অধিক বৈচিত্রসম্পন্ন করবার জন্য। একটি লড়ীর নমুনা—

ঘেঘেতেটে গদিঘেনে নাগতেরে কেটেতাক
o
তাগতেটে ঘেঘেতেটে গদিঘেনে নাগেতেটে | ধা
৩ ×

॥ বাঁট ॥

লগ্গীর বিস্তারকেই বলা হয় বাঁট। কিন্তু মতান্তরে যে কোনও বোলের বর্ণসমষ্টিকে উল্টা-পাল্টা প্রয়োগকে বাঁট বলা হয়। বাঁটকে কায়দা ও পেশকারের একপ্রকার সম্মিলিতি রূপ বলা চলে। নিম্নে একটি ত্রিতালের বাঁটের নমুনা দেওয়া হল।—

ধিন তেরেকেটে ধিন না | ধা ধিন্ ধিন্ না—
× ২
তিন তেরেকেটে তিন না | না ধিন ধিন না | ধা
o ৩ ×

॥ তিহাই বা তীহা ॥

কোনও তালের সম বা ফাঁক হতে আরম্ভ হয়ে যে বোল তিনবার বাজাবার পর সমে এসে সমাপ্ত হয় তাকে বলা হয় তিহাই বা তীহা। সম বা ফাঁক হতে আরম্ভ না করে অন্য যে কোনও মাত্রা হতে তিহাই সুরু করা যেতে পারে, তবে সেই অংশটি তিনবার বাজাতেই হবে এবং সমে এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। তিহাই দুই প্রকার—দমদার ও বেদমদার।—

দমদার তিহাই—তিহাইয়ের তিনটি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ থেমে থেমে (Pause) বাজিয়ে সমে এলে তাকে বলা হয় দমদার তিহাই। যথা—

| ধা, তেরে কেটেতাক ধা—, ধাতেরে | কেটেতাক ধা—, ধাতেরে
| ০ | ৩

কেটেতাক | ধা
| ×

বেদমদার তিহাই—কোথাও না থেমে তিনটি বিভাগ বাজিয়ে সমে এসে শেষ যে বোল শেষ হয় তাকে বলা হয় বেদমদার তিহাই। যথা—

ধাতেরেকেটেতাক তাতেরেকেটেতাক ধা,তেরেকেটে
০

ধাতেরেকেটেতাক

তা তেরেকেটেতাক ধা,তেরেকেটে ধাতেরেকেটেতাক
৩

তাতেরেকেটেতাক | ধা

।। কিসিম্ (প্রকার) ।।

কোনও তালের তালি, খালি বিভাগাদি ইত্যাদি যথাযথ রেখে ঠেকার বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োগকে বলা হয় কিসিম বা প্রকার। যেমন—

| ধাতি নাতি তাতা ধিনা | ধা ধিন্ ধাগে তিন |
| × | ২ |

| নাতি নাতি নানা ধিনা | না ধিন নাগে ধিন |
| ০ | ৩ |

।। লহরা ।।

একক তবলা বাদনে (Solo) কায়দা, পেশকার, রেলা ইত্যাদি সহযোগে বিভিন্ন লয়কারীতে বোল বাজান হলে তাকে লহরা বলা হয়। তবলা বাদনে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন না করলে লহরা বাজান সম্ভব হয় না। লহরা বাজাবার সময় কোন একটি যন্ত্রে (হারমনিয়াম,

সারেঙ্গী ইত্যাদি) যে কোনও একটি রাগের গতের প্রারম্ভিক অংশটুকু বারবার বাজান হয় ফাঁক ও সম স্পষ্ট করে বোঝার জন্য।

॥ সাথসঙ্গত ॥

নৃত্য, গীত বা বাদ্যের ছন্দানুযায়ী সঙ্গত করা হলে তাকে বলা হয় সাথসঙ্গত। অর্থাৎ শিল্পী যে ছন্দেরই প্রয়োগ করবেন তবলা—বাদকও তবলায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেই একই ছন্দে তাঁকে অনুসরণ করবেন। তবে অনেকের মতে শিল্পী প্রথমে ছন্দের প্রয়োগ করবেন এবং তাঁর সেই বিশেষ ছন্দের কাজ শেষ হলে তবলা বাদক শিল্পী কর্তৃক প্রযুক্ত সেই বিশেষ ছন্দটি তবলায় যথাযথ প্রয়োগ করে দেখালে তাকে সাথসঙ্গত বলে। সাথসঙ্গত করতে হলে বিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। নৃত্য, গীত বা বাদ্যে সাথসঙ্গত অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর।

॥ গৎ ॥

তিহাই বর্জিত খালি ও ভরীযুক্ত লয় বৈচিত্র্যসম্পন্ন রচনাকে বলা হয় গৎ। গতের আকার ছোট এবং বড় দুই প্রকারই হতে পারে। সাধারণতঃ গৎগুলি বিলম্বিত লয়ে বাজাবার পর দ্বিগুণ, তিনগুণ ও চৌগুণ লয়ে বাজান হয়। গতের দুইটি শ্রেণী আছে—শুদ্ধ ও মিশ্র।

শুদ্ধ গৎ—একটি মাত্র বরাবর লয়ে যে গৎ বাজান হয় তাকে বলা হয় শুদ্ধ গৎ।

মিশ্র গৎ—একাধিক লয়ের মিশ্রনজাত যে গৎ তাকে বলা হয় মিশ্র গৎ। মিশ্র গৎ লক্ষ্ণৌ ও বেনারস ঘরাণার বৈশিষ্ট্য।

শুদ্ধ ও মিশ্র ব্যতীত গতের আরও কয়েকটি প্রকার আছে, যথা—দুপল্লী, তিপল্লী এবং চৌপল্লী গৎ।

দুপল্লী গৎ—পল্লী অর্থে বিভাগ। দুটি বিভাগে দুই প্রকার লয়ের মিশ্রণজাত গৎকেই বলা হয় দুপল্লী গৎ।

তিপল্লী গৎ—তিনটি ভাগে ক্রমান্বয়ে তিনটি লয়ের মিশ্রণজাত গৎকে বলা হয় তিপল্লী গৎ।

চৌপল্লী গৎ—চতুর্বিভাগে ক্রমান্বয়ে চারটি লয়ের মিশ্রণজাত গৎকে বলা হয় চৌপল্লী গৎ।

চতুর্থ অধ্যায়

।। তালের দশবিধ প্রাণ ।।

প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রাদিতে তালের ১০টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাদের তালের দশপ্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। "সংগীতমকরন্দ"—কার নারদের মতে এই দশটি প্রাণ হল :

"কালো মার্গ—ক্রিয়াঙ্গানি গ্রহোজাতিঃ কলা লয়ঃ।
যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণা দশস্মৃতাঃ" ।।

অর্থাৎ কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার—এই দশটি বিষয় হচ্ছে তালের দশটি প্রাণ।

নিম্নে সংক্ষেপে তালের ১০টি প্রাণের আলোচনা করা হল।—

(ক) ।। কাল ।।

সংগীতের অর্থাৎ গীত, বাদ্য বা নৃত্যের নির্দিষ্ট সময় সীমাকে বলা হয় কাল। এই কাল—এর উপর সমগ্র তাল পদ্ধতির কাঠামো দণ্ডায়মান। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাল নির্ণয় করেছেন, তবে সেই সকল পদ্ধতি সর্ব্ববাদিসম্মত নয়। কালকে আবার সূক্ষ্ম ও স্থূল—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।—

(খ) ।। মার্গ ।।

মার্গ অর্থে পথ। মার্গ দ্বারা তালের মাত্রাসংখ্যা, পদসংখ্যা, গতিভঙ্গি, তালি, খালি এবং সেইগুলির অবস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে

অবহিত হওয়া যায়। এককথায় বলা যায় যে, এর দ্বারা তালের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রকৃতি বিচার করা যায়। শাস্ত্রে প্রধানতঃ চারটি মার্গের উল্লেখ আছে। যথা—ধ্রুব, চিত্র, বার্ত্তিক ও দক্ষিণ। তালের পদ পরিবর্তনের প্রয়োজনেই এই চারটি মার্গ ব্যবহৃত হয়।

(১) ধ্রুবমার্গ: একমাত্রিক পদ এবং প্রথম মাত্রায় তালাঘাত।

(২) চিত্রমার্গ: দ্বিমাত্রিক পদ। প্রথম মাত্রায় তালাঘাত ও দ্বিতীয় মাত্রায় ফাঁক।

(৩) বার্ত্তিকমার্গ: চতুর্মাত্রিক পদ। ১ম মাত্রায় তালাঘাত ও ৩টি মাত্রায় ফাঁক।

(৪) দক্ষিণ মার্গ: অষ্টমাত্রিক পদ। ১ম মাত্রায় তালাঘাত ও ৭টি মাত্রায় ফাঁক।

কোনও মতে ৬টি মার্গের উল্লেখও পাওয়া যায়। যথা: চিত্র, চিত্রতর, চিত্রতম, অতিচিত্রতম, বার্ত্তিক ও দক্ষিণ।

(১) চিত্র —২ মাত্রিক পদ
(২) চিত্রতর —১ ,, ,,
(৩) চিত্রতম —১/২ ,, ,,
(৪) অতিচিত্রতম—১/৪ ,, ,,
(৫) বার্ত্তিক—৪ ,, ,,
(৬) দক্ষিণ—৮ ,, ,,

অন্যমতে উপর্যুক্ত ৬টি মার্গ ব্যতীত আরও ৬টি মার্গের উল্লেখ আছে। যথা—চতুর্ভাগ, ত্রুটি, অনুত্রুটি, ঘর্ষণ, অনুঘর্ষণ এবং স্বর।

(১) চতুর্ভাগ —১/৮ মাত্রিক পদ
(২) ত্রুটি —১/১৬ ,, ,,
(৩) অনুত্রুটি —১/৩২ ,, ,,
(৪) ঘর্ষণ —১/৬৪ ,, ,,
(৫) অনুঘর্ষণ —১/১২৮ ,, ,,
(৬) স্বর —১/২৫৬ ,, ,,

(গ) ॥ ক্রিয়া ॥

তাল প্রদর্শক কর্মকে বলা হয় ক্রিয়া। হাতে তালি দেওয়া, ‍‍ুলী গণনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। য়া দুই প্রকারের—সশব্দ এবং নিঃশব্দ। সশব্দ ক্রিয়া চার প্রকার, ..া : ধ্রুব, শম্যা, তাল ও সন্নিপাত এবং নিঃশব্দ ক্রিয়াও চার প্রকার, যথা : আবাপ, নিষ্ক্রম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ।—
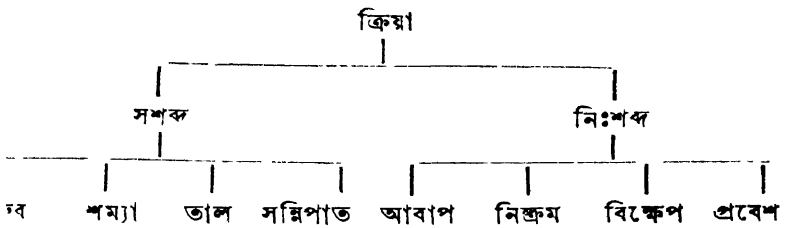
শব্দ ক্রিয়া :—(১) ধ্রুব —তর্জনী বা বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে আঘাত।
(২) শম্যা —বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তে আঘাত।
(৩) তাল —দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে বাম হস্তে আঘাত।
(৪) সন্নিপাত—উভয় হস্ত দ্বারা আঘাত।

নিঃশব্দ ক্রিয়া :—

(১) আবাপ—চারটি আঙ্গুল একত্রিত করে উর্দ্ধে হস্তচালনা।
(২) নিষ্ক্রম—উন্মুক্ত চারটি অঙ্গুলীসহ দক্ষিণ দিকে বাহু চালনা।
(৩) বিক্ষেপ—উন্মুক্ত অঙ্গুলী সহ হস্ত চালনা।
(৪) প্রবেশ—হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় নিম্নাভিমুখে চালনা।

দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে নিঃশব্দ ক্রিয়ার অন্যতম একটি ক্রিয়ার নাম বিসর্জিতম। ফাঁককে বলা হয় বিসর্জিতম্ বা বিচ্‌চে। বিসর্জিতম তিন প্রকার, যথা : কৃষয়, সর্পিণী ও পতাকম্।

(১) কৃষয় —বাম দিকে হস্তচালনা।
(২) সর্পিণী —দক্ষিণ দিকে হস্ত চালনা।
(৩) পতাকম্—হস্তকে উর্দ্ধাভিমুখী করা।

(ঘ) ॥ অঙ্গ ॥

অঙ্গ বলতে বোঝায় তাল বিভাগ। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে এই অঙ্গ বিভাগ বিশেষ করে মানা হয়। অঙ্গের সংখ্যা প্রধানতঃ ছয়টি। যথা: অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত এবং কাকপদ। নিম্নে এই ষড়াঙ্গের চিহ্ন ও অক্ষর কাল (সময়-পরিমাপক সংখ্যা) প্রভৃতি উল্লেখ করা হল।

অঙ্গের নাম	চিহ্ন	অক্ষর কাল
(১) অনুদ্রুত	⌣	১
(২) দ্রুত	০	২
(৩) লঘু	|	৪
(৪) গুরু	8 বা ঃ	৮
(৫) প্লুত	৮ বা ৩	১২
(৬) কাকপদ	+	১৬

উপরি উক্ত ষড়াঙ্গ ব্যতীত অনেকে আবার আরও দশটি অঙ্গের উল্লেখ করে অঙ্গের সংখ্যা ষোড়শটি বলে নির্ধারিত করেছেন। এই অতিরিক্ত ১০টি অঙ্গের নাম হচ্ছে যথাক্রমে—

(১) দ্রুত বিরাম, (২) লঘু বিরাম, (৩) লঘু দ্রুত, (৪) লঘু দ্রুত বিরাম, (৫) গুরু বিরাম, (৬) গুরু দ্রুত, (৭) গুরু দ্রুত বিরাম, (৮) প্লুত বিরাম, (৯) প্লুত দ্রুত, (১০) প্লুত দ্রুত বিরাম।

(ঙ) ॥ গ্রহ ॥

তালের যে বিশেষ মাত্রাটি থেকে সংগীতারম্ভ হয় সেই স্থানটিকেই বলা হয় গ্রহ। গ্রহ দুই ভাগে বিভক্ত— সম ও বিষম গ্রহ। বিষম

গ্রহকে আবার অতীত ও অনাগত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।
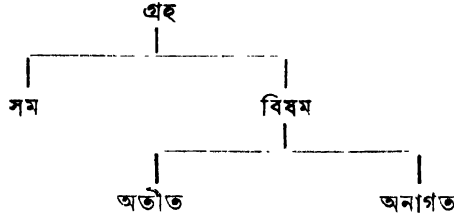
সম—তালের প্রথম মাত্রা হতে সংগীতারম্ভ হলে সেই বিশেষ স্থানটিকে বলা হয় সমগ্রহ।

বিষম—সম্‌-এর পূর্বে অথবা পরে যে স্থান হতে সংগীতারম্ভ হয় সেই বিশেষ স্থানটিকে বলা হয় বিষম গ্রহ।

অতীত—সম্‌-এর পরবর্তী যে স্থান হতে সংগীতারম্ভ হয় তাকে বলা হয় অতীত গ্রহ।

অনাগত—সম্‌-এর পূর্বেই কৃত্রিমভাবে যে স্থানে সম্‌ দেখান হয় তাকে বলে অনাগত গ্রহ।

(চ) ॥ জাতি ॥

তালের একাধিক জাতি বর্তমান। 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে মোট পাঁচ প্রকার জাতির উল্লেখ আছে, যথা—তিস্র, চতস্র, খণ্ড, সংকীর্ণ ও মিশ্র। এই পাঁচটি জাতির মধ্যে চতস্র জাতিকে ব্রাহ্মণ, তিস্র জাতিকে ক্ষত্রিয়, খণ্ড জাতিকে বৈশ্য, মিশ্র জাতিকে শূদ্র ও সংকীর্ণ জাতিকে সংকীর্ণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। পাঁচটি জাতি সম্পর্কে, 'সংগীত দর্পণ'-এ উল্লেখ আছে যে তিস্র তিনবর্ণ, চতস্র চারবর্ণ, খণ্ড পাঁচবর্ণ, মিশ্র সাতবর্ণ এবং সংকীর্ণ নয়বর্ণ।

(ছ) ॥ কলা ॥

তালের নিঃশব্দ ক্রিয়াকে বলা হয় কলা এবং ক্রিয়াকে বলে 'কলাপাত' বা 'পাতকলা'। অনেকে কলা ও তালকে সমার্থক বলেছেন। ভরত 'কলা' অর্থে বলেছেন মন্দলয়। কারণ কলানুসারে তালের গতি নির্দ্ধারিত হত। ৮ মাত্রায় এককলা বিশিষ্ট তাল দ্বিকলায় পরিবেশিত হলে তার মাত্রা সংখ্যা হবে ১৬, চতুষ্কলায় পরিবেশিত হলে মাত্রাসংখ্যা হবে ৩২।

(জ) ॥ লয় ॥

বিস্তারিত আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(ঝ) ॥ যতি ॥

তালের দশ প্রাণের একটি প্রাণ হচ্ছে যতি এবং সংগীতে গতি প্রয়োগের নিয়মকে বলা হয় যতি। যতি পাঁচ প্রকার—সমা, সরিৎ (স্রোতাগতা), মৃদঙ্গ, ডমরু (পিপীলিকা) এবং গোপুচ্ছা।

সমা: আদি, মধ্য এবং অন্তে একই প্রকার গতি হলে তাকে বলা হয় সমা যতি।

সরিৎ: আদিতে বিলম্বিত এবং মধ্য ও অন্তে দ্রুত গতি সম্পন্ন যতিকে বলা হয় সরিৎ বা স্রোতাগতা যতি।

মৃদঙ্গ: আদি ও অন্তে দ্রুত এবং মধ্যে মধ্য ও দ্রুতের মিশ্রণে মৃদঙ্গ যতি হয়।

ডমরু: আদি ও অন্তে বিলম্বিত এবং মধ্যস্থানে দ্রুত গতির সমাবেশ হলে তাকে ডমরু বা পিপীলিকা যতি বলা হয়।

গোপুচ্ছা: আদিতে দ্রুত, মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত গতির ক্রিয়া হলে তাকে বলা হয় গোপুচ্ছা যতি।

(এঃ) ॥ প্রস্তার ॥

প্রস্তারের অর্থ বিস্তার। প্রাচীন কালে নানাভাবে তালের প্রস্তার করা হত। যেমন সংগীতদামোদর—কার তালের প্রস্তার প্লুত হতে আরম্ভ করে গুরু, লঘু ও দ্রুত মাত্রায় শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তার রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বর্তমান কালে প্রাচীন কালের এই তাল প্রস্তার রীতি আর অনুসৃত হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ ঘরাণা ও বাজ ॥

প্রত্যেক তবলা বাদকের বাদনরীতির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যাকে আমরা বাদন-শৈলী বলি। এই বাদন-শৈলী সৃষ্টির সম্মান এক একটি বিশেষ বংশকে দেওয়া হয় এবং তাঁদেরই আখ্যা দেওয়া হয় ঘরাণা বা ঘরোয়ানা। অর্থাৎ ঘরাণা অর্থে আমরা বুঝি বিশেষ একটি বংশ এবং তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের। সেই বিশেষ বংশের বাদন-শৈলীকেই বলা হয় বাজ। বাদন-শৈলী অর্থে বাদ্যের রীতি, নীতি, বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য (Style) ইত্যাদি। বিভিন্ন ঘরাণার বাদন-শৈলী বৈশিষ্ট্য দ্বারা একটি ঘরাণা হতে অপরটির পার্থক্য বোঝা যায়। ভারতে মোট ছয়টি ঘরাণার বিকাশ দেখা যায়। যথা—(১) দিল্লী ঘরাণা, (২) লক্ষ্ণৌ ঘরাণা, (৩) বেনারস ঘরাণা, (৪) ফরুখাবাদ বা ফরাক্কাবাদ ঘরাণা, (৫) পাঞ্জাব ঘরাণা এবং (৬) অজরাড়া ঘরাণা। এই ছয়টি ঘরাণা ছয়টি বাজের (Style) উদ্ভাবক। নিম্নে প্রত্যেকটি ঘরাণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাঁদের বাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

॥ দিল্লী ঘরাণা ॥

ওস্তাদ সুধার খাঁ যাঁকে সর্বপ্রথম তবলা-বাদন প্রচারের সম্মান দেওয়া হয়, তিনিই ছিলেন দিল্লী ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দিল্লীর

অধিবাসী ছিলেন বলেই তাঁর বংশধর অথবা শিষ্য-প্রশিষ্যদের বলা হয় 'দিল্লী ঘরাণা' এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত বাজকে বলা হয় 'দিল্লী বাজ'। সুধার খাঁর তিন পুত্র—বুগরা খাঁ, ঘসীট খাঁ, তৃতীয় পুত্রের নাম পাওয়া যায় না এবং তিন শিষ্য রোশন খাঁ, কল্লু খাঁ ও তুল্লন খাঁর দ্বারাই দিল্লী বাজ নিজের একটি স্বাতন্ত্র্য আসন করে নেয়। পরবর্তীকালে অবশ্য এই বংশে অনেক ভারত-বিখ্যাত তবলিয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁরা দিল্লী ঘরাণাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। বুগরা খাঁর দুই পুত্র সিতাব খাঁ ও গুলাব খাঁর মধ্যে দুজনেই তবলা-বাদনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। সিতাব খাঁর পুত্র নজর আলি এবং পৌত্র বড়ে কালে খাঁ দিল্লী ঘরাণার প্রতিনিধিস্থানীয় তবলা-বাদক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বড়ে কালে খাঁর পুত্র বোলী বক্স ছিলেন ভারত বিখ্যাত তবলিয়া। নথ্থু খাঁ ছিলেন বোলী বক্সের পুত্র এবং মুনীর খাঁ ছিলেন বোলী বক্সের শিষ্য। নথ্থু খাঁর শিষ্য হবীবুদ্দীন খাঁ তবলা বাদনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তবে মুনীর খাঁর তিন শিষ্য—আহম্মদজান খিরকুয়া, আমীর হুসেন এবং শামসুদ্দীন খাঁর মধ্যে আহম্মদজান খিরকুয়াই সর্বভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

বুগরা খাঁর অপর পুত্র গুলাব খাঁর পুত্র-প্রপৌত্রদের নাম যথাক্রমে মহম্মদ খাঁ, ছোট কালে খাঁ, গামে খাঁ এবং ইনাম আলি খাঁ। সিতাব খাঁর অপর পুত্র ঘসীট খাঁর বংশাবলী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না; তবে তার অজ্ঞাত-নামা পুত্রের বংশে তিনটি নাম পাওয়া যায়—মক্কু খাঁ, বখসু খাঁ এবং মোদু খাঁ। বখসু খাঁ ও মোদু খাঁ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের আমন্ত্রণে স্থায়ীভাবে লক্ষ্ণৌ বসবাস করেন এবং লক্ষ্ণৌ বাজ নামে এক নূতন বাদ্য-শৈলীর প্রবর্তন করেন। নিম্নে দিল্লী ঘরাণার বংশাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হল।
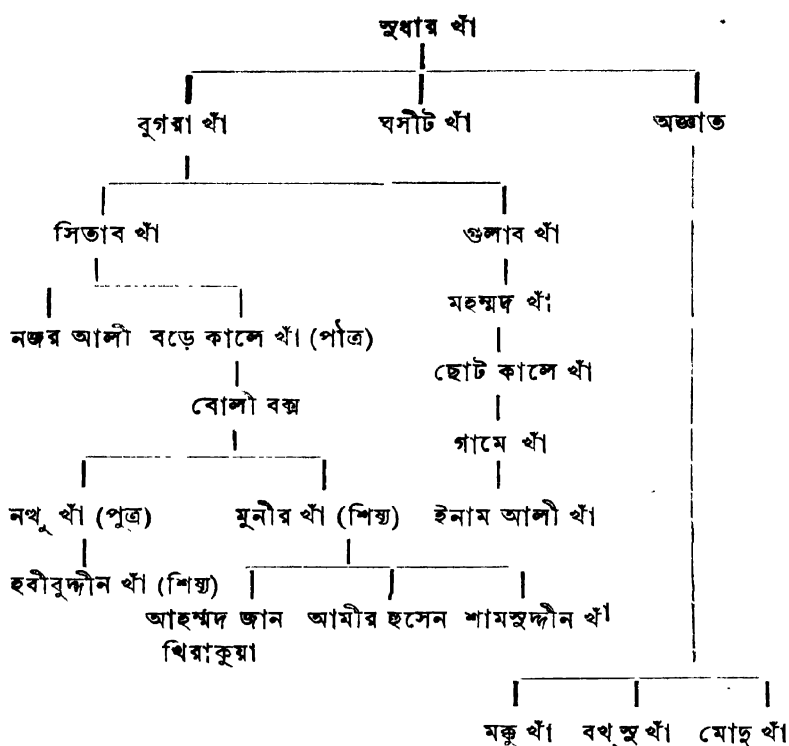
॥ দিল্লী বাজের বৈশিষ্ট্য ॥

(১) তর্জনী এবং মধ্যমার প্রয়োগ আধিক্য আছে।

(২) কিনার বা চাটীতে বোলের কাজ বেশী করা হয়। সেইজন্য দিল্লী বাজের আর একটি নাম "কিনার কা বাজ।" এই বাজে গাবের কাজেরও প্রাধান্য আছে।

(৩) এই বাজে ছোট ছোট মুখড়া, মোহরা, কায়দা, পেশকার, রেলা ইত্যাদির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; বড় পরণ, রেলা ইত্যাদির প্রয়োগ করা হয় না।

(৪) এই বাজে ধিন, ধিন, তেটে, তেরেকেটে ক্রেধাতেটে, ঘেনাতেটে, ধেটেতেটে ইত্যাদি বর্ণগুলি অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হয়ে থাকে।

নিম্নে দিল্লী বাজের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

॥ কায়দা ॥

(১) ধাগিতেটে তেটেধাগি তেটেধাগ ধিনাগেনা
×
ধেটেতেটে ধাগিতেটে তেটেধাগ দিনাকেনা
২
তাকিতেটে তেটেতাকি তেটেতাক দিনাকেনা
০
ধেটেতেটে ধাগিতেটে তেটেধাগ ধিনাগেনা
৩

(২) ঘেনাতেটে ঘেনেধা— ধিন্নাঘেনা তেটেঘেনা—
×
ধাত্রেকেটেধা ঘেনাতেটে ঘেনেধাগ দিনাকেনা—
২
কেনাতেটে কেনেতা— দিন্নাকেনা তেটেকেনা—
০
ধাত্রেকেটেধা— ঘেনাতেটে ঘেনেধাগ ধিনাঘেনা
৩

॥ টুকড়া ॥

ধাক্রেধে তেটেধাগি তেটেধাদি নাতেটেতা—
×
দিন্‌তাতেটে কতেটেতা —ঘিনতা ধাক্রান—
২

ধাতেটে কতেটেতা —ঘিনত্তা ধাক্রান—
০
ধাতেটে কতেটেতা —ঘিনত্তা ধাক্রান—
৩

॥ গৎ ॥

ধা ঘেনানেঘেনে তেটেঘেনানেধা ঘেনাতেটেঘেঘেনাগ
×
তেটেকতা কেকেনাক | ধেটেতেটে ধাঘেঘে নাকধাতেটেকেটে
২
ঘেনাতেটে ঘেঘেনাগ তেটেকতা কেকেনাক |
তাকেনানেকেনে তেটেকেনানেতা কেনাতেটে কেকেনাক
০
তেটেকতা কেকেনাক | ধেটেতেটেধাঘেঘে নাকধাতেটেকেটে
৩
ঘেনাতেটে ঘেঘেনাগ তেটেকতা ঘেঘেনাগ

॥ লগ্ গী ॥

(১) ধাধিন ধাক্রে নাধিন নাক্রে
×
(২) ঘেনাকতা ঘেঘেনাগ কেনাকতা কেকেনাগ
×

॥ রেলা ॥

ধাগিনেধা —রেধা ধাঘেঘে নাকধেনে
×
ধাগিত্রেকেটে ধিনাঘেনে নাগদেনে দ্বিনাকেনে
২

লক্ষ্ণৌ বাজের কয়েকটি উদাহরণঃ—

॥ টুকড়া ॥

ধেন্‌ত্রেকেটে তাগিতেটে কতাধেনা ধা
×

তুনাঘেনাতুনা ধাতুনা ধাতুনা ধাতু না কতা
২

না কতা ধেনা তুনা ধাতুনা ধাতুনা ধাতু
০

না কতা ঘেনাতুনা ধাতুনা ধাতুনা ধাতু
৩

॥ লগ্‌গী ॥

(১) ধা ধিন্ ধারা | ধা তিন্ নারা
× | ২

তা তিন্ ধারা | ধা ধিন নারা
| ৩

॥ বেনারস ঘরাণা ॥

লক্ষ্ণৌ ঘরাণার অন্যতম উদ্ভাবক উস্তাদ মোদু খাঁর শিষ্য পণ্ডিত রাম সহায় বেনারস ঘরাণার সৃষ্টিকর্ত্তা। পণ্ডিত রামসহায় দীর্ঘ বার বৎসর লক্ষ্ণৌয়ে তবলা শিক্ষা করে জন্মভূমি বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং বেনারস ঘরাণা নামে একটি নতুন শৈলীর প্রবর্তন করেন। এবং ই বংশে বেনারস ঘরাণাকে যাঁরা সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় করেন তাঁদের পুত্র ধ্য পণ্ডিত রামসহায়ের ভ্রাতা জানকী সহায় ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরী এবং হায়ের পুত্র ভৈরো সহায়, ভৈরো সহায়ের পুত্র বলদেব সহায়, এবং চলে। হ দুর্গা সহায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ্য।

বলদেব সহায়ের শিষ্য পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজকে বেনারস ঘরাণার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই মহান শিল্পী মাত্র তিন বছর পূর্বে ১৯৬৯ সালে দেহ রক্ষা করেছেন। কণ্ঠে মহারাজ ব্যতীত বেনারস ঘরাণার অন্যান্য সার্থক প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যে কণ্ঠে মহারাজের পুত্র কিষণ মহারাজ, পণ্ডিত শান্তা-প্রসাদ, পণ্ডিত আনোখেলাল, নান্নু সহায়, নীরু মিশ্র, পণ্ডিত শ্যামলাল, শ্রী লালজী শ্রীবাস্তব, পণ্ডিত জিয়ালাল, কণ্ঠে মহারাজের শিষ্য শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ কুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ বেনারস ঘরাণার বংশাবলীর তালিকা ॥
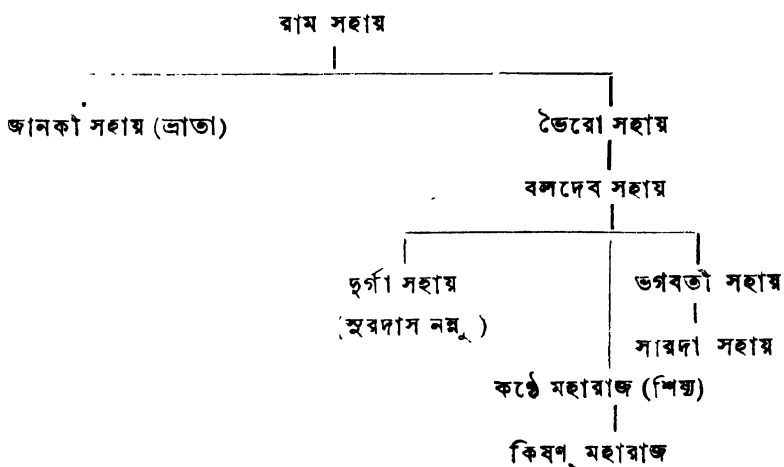
॥ বেনারস বাজের বৈশিষ্ট্য ॥

(১) বেনারস বাজের সর্ব্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এতে লগ্গী, লড়ী, ছন্দ, গৎ ইত্যাদির প্রয়োগ-বাহুল্য আছে। এইগুলি ব্যতীত বড় বড় পরণ, কায়দা, পেশকার ইত্যাদিও যথেষ্ট বাজান হয়।

(২) পাখোয়াজ—আঙ্গের বোল বা বর্ণের আধিক্য দেখা যায়।
(৩) আওয়াজ গম্ভীর এবং জোরদার।
(৪) থাপ, লব ও গাবের কাজ বেশী।
(৫) বাঁয়ার কাজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বেনারস বাজের কয়েকটি উদাহরণ :—

॥ রেলা ॥

ধাঘেনে ধারাঘেনে ধাঘেনে ধারাঘেনে
×
ধাঘেনে ধারাঘেনে নাকদেরে দিনাকেনে
২
তাকেনে তারাকেনে তাকেনে তারাকেনে
০
ধাঘেনে ধারাঘেনে নাকধেরে ধিনাঘেনে

॥ টুকড়া ॥

কত্তাধা দিগেনেতা ত্রেকেটেতাকৃতানে তেটেকতানে
×
ধা —ক্রেধিন্‌ধিন ধা,ক্রেধিনধিন ধা,ক্রেধিনধিন
২
ধা —ক্রেধিন্‌ধিন ধা, ক্রেধিন্‌ধিন ধা,ক্রেধিন্‌ধিন্‌
০
ধা —ক্রেধিন্‌ধিন ধা, ক্রেধিন্‌ধিন ধা, ক্রেধিন্‌ধিন

॥ কায়দা ॥

ধিক্‌ ধিনা তেটে ঘেনে | ধাগে নাতিক্‌—তিনাড়া
× | ২
তিক্‌ তিনা তেটে ঘেনে | ধাগে নাধিক্‌—ধিনাড়া
০ | ৩

॥ লগ্‌গী ॥

(১) ধিগ্‌না ধি—গ্‌ তিনাড়া | তিক্‌না ধি—গ্‌ ধিনাড়া
×

(২) তাক্‌ধেড়ে নাগ্‌নাগ্‌ নাক্‌তেড়ে নাক্‌নাক্‌
×
তাক্‌ধেড়ে নাগ্‌নাগ্‌ নাক্‌ধেড়ে নাগ্‌নাগ

॥ ফরুখাবাদ বা ফরাক্কাবাদ ঘরাণা ॥

লক্ষ্ণৌ ঘরাণার বখ্‌সু খাঁর জামাতা হাজীবিলায়েত আলী খাঁ ফরুখাবাদ বা ফরাক্কাবাদ ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। উস্তাদ আহম্মদজান থিরাক্‌য়ার গুরু মুনীর খাঁ ছিলেন বিলায়েত আলী খাঁর পুত্র হুসেন আলী খাঁর শিষ্য। এই বংশের যারা তবলিয়া হিসাবে সুনাম অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে হুসেন আলী খাঁর পুত্র ননহে খাঁ, পৌত্র মসীত খাঁ এবং প্রপৌত্র কেরামৎ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে উস্তাদ কেরামৎ খাঁ ফরুখাবাদ ঘরাণার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মসীত খাঁ সাহেবের শিষ্যদের মধ্যে উস্তাদ মুন্নে খাঁ, শ্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষ এবং শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ভারতের প্রথম সারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক। এই ঘরাণার আরও কয়েক জন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন শামসুদ্দীন খাঁ, আমীর খাঁ, গোলাম রসুল, ইমাম বক্স খাঁ, ছুন্নু খাঁ, সলারী খাঁ, মুবারক আলি ইত্যাদি। শেষোক্ত চারজন বিলায়েত খাঁর শিষ্য ছিলেন।

॥ ফরুখাবাদ ঘরাণার বংশাবলীর তালিকা ॥

হাজী বিলায়েত আলী খাঁ
|
হুসেন আলী খাঁ
|
নন্‌হে খাঁ
|
মসীত খাঁ
|
কেরামৎ খাঁ

॥ ফরুখাবাদ বাজের বৈশিষ্ট্য ॥

লক্ষ্ণৌ, বেনারস এবং ফরুখাবাদ এই তিন ঘরাণার বাদন শৈলীর মধ্যে পার্থক্য খুব কমই আছে। কারণ লক্ষ্ণৌ ঘরাণা হতেই বেনারস এবং ফরুখাবাদ ঘরাণার উৎপত্তি হয়েছে। তাই এই তিনটি ঘরাণাকে পূরব বাজের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। তবে ফরুখাবাদ ঘরাণার বাদন শৈলীতে গতের চাল বিশেষ মহত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যসম্পন্ন এবং একক বাদনে (Solo) এখানে উঠানের পরিবর্তে প্রথমে পেশকার বাজান হয়।

ফরুখাবাদ বাজের কয়েকটি উদাহরণ :—

॥ গৎ ॥

তাগধেনে ধেনেধাগি ত্রেকেটেধেনে ঘেনেধা
×

—ধেনে ঘেনেধাগি ত্রেকেটদেনে কেনেতা
২

তাকতেনে কেনেতাকি ত্রেকেটদেনে কেনেতা
০
—ধেনে ঘেনেধাগি ত্রেকেটধেনে ঘেনেধা
৩

॥ চলন ॥

ধাতিধা ধাতিঘেনে ধিন্নাঘেনে ধাতিধা
×
ক্রেধেত্তা ঘেনাতেৎ ধাতিঘেনে দিন্নাকেনে
২
তাকেটেতাক তাকেটেতাক তাত্রেকেটেতাক তাত্রেকেটেতাক
০
ত্রেকেটেতাকতাক ত্রেকেটেধাতি ধগিনেধা তেত্তাঘেনে
৩

॥ কায়দা ॥

ধাকেটে তাকধা ঘেড়েনাগ তেৎ
×
ধাধা ঘেড়েনাগ দিনতা কেড়েনাক
২
তাকেটে তাকধা ঘেড়েনাগ ধেৎ
০
ধাধা ঘেড়েনাগ ধিনতা ঘেড়েনাগ
৩

॥ টুকড়া ॥

তা কেটেতাক ধি | কেড়েনাগ ধেৎ | ধাক্রেধা— |
—নেধা | গদ্দি (২) | কত্তা ধা | কেড়েনাক তেরেকেটে |
তাগ ধেরেধেরেকেটে | ধা ক্রান (০) | ধা কেড়েনাক |

তেরেকেটে তাগ ধেরে | ধেরেকেটে | ধাক্রান |
৩

ধা কেড়েনাক | তেরেকেটে তাগ ধেরে | ধেরেকেটে ধাক্রানধা

॥ পাঞ্জাব ঘরাণা ॥

লক্ষ্ণৌ ঘরাণা হতে বেনারস এবং ফরুখাবাদ ঘরাণার উৎপত্তি এবং স্বয়ং লক্ষ্ণৌ ঘরাণার উৎস হচ্ছে দিল্লী ঘরাণা ; তাই এই চারটি ঘরাণার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু পাঞ্জাব ঘরাণা একেবারেই পৃথক, অন্য কোনও ঘরাণার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই। হুসেন বক্স পাঞ্জাব ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। হুসেন বক্সের পুত্র ফকীর বক্সকেই এই বংশের শ্রেষ্ঠ তবলিয়া বলে স্বীকার করা হয়। ফকীর বক্সের পুত্র কাদির বক্সও তবলা বাদনে সুনাম অর্জন করেন। ফকীর বক্সের শিষ্যবর্গের মধ্যে মলন খাঁ ও করম ইলাহী খাঁর নাম উল্লেখ-যোগ্য। বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক উস্তাদ আল্লারাখা কাদির বক্সের শিষ্য।

॥ পাঞ্জাব ঘরাণার বংশতালিকা ॥
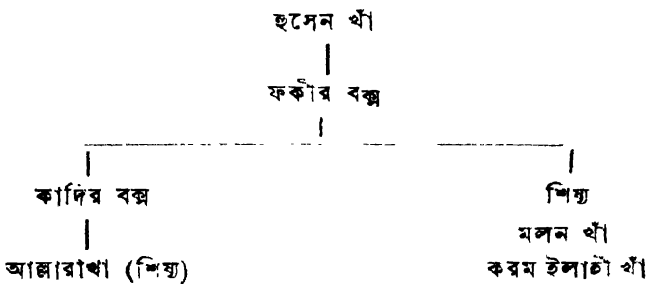
॥ পাঞ্জাব বাজের বৈশিষ্ট্য ॥

(১) পাঞ্জাব বাজে পাখোয়াজের প্রভাব আধিক্যের জন্য এই বাজে পাখোয়াজের খোলা বোল বন্ধ বোলে রূপান্তরিত হয়েছে।

(২) বড় বড় কায়দা, পেশকার, গৎ, পরণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

(৩) অনেকে বাঁয়ার স্থাহী (গাব) অংশে বাজাবার পূর্বে আটা বা ময়দা লাগিয়ে নেন বাঁয়ার আওয়াজকে আরও গম্ভীর করবার জন্য।

(৪) বোলে পাঞ্জাবী ভাষার প্রভাব আছে। যেমন—ক্রাতান, দুংগ নগ, ধাধি নাড়, গদ্দি নাড় ইত্যাদি।

পাঞ্জাব বাজের একটি উদাহরণ:

॥ ত্রিতাল ॥

[আড়ি গৎ]

ঘেড়ান্ ধাতেটে ধাগেনে ধা—তেরেকেটে
×

ঘেড়ান্ তাকেটে তাঘেনে কতেটে
২

তাকধা না—ন্ তাক্‌ধা না—ন্
০

ক্রান্‌তা ধা—:ঘড়েনাক ধেরেধেরেকেটেতাক নাগতাকক্রান্

॥ অজরাড়া ঘরাণা ॥

দিল্লীর নিকটবর্তী মীরাটের একটি গ্রামের নাম অজরাড়া। এই ঘরাণার উদ্ভাবক কল্লু খাঁ এবং মীরু খাঁ নামে দুই ভ্রাতা অজরাড়া গ্রামে বাস করতেন বলে তাঁদের ঘরাণা অজরাড়া ঘরাণা নামে সুপরিচিত। এই ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন সীতাব খাঁর শিষ্য। তাঁরা দিল্লীতে সীতাব খাঁর কাছে তবলার তালিম নিয়ে নিজ গ্রামে এসে দিল্লী ঘরাণার কিছু হেরফের ঘটিয়ে এই নতুন ঘরাণার পত্তন করেন। এই বংশের মধ্যে তবলা বাদনে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন কল্লু খাঁর পুত্র মহম্মদ বখ্‌স, পৌত্র চাঁদ খাঁ এবং প্রপৌত্র কালে খাঁ। অন্যান্য সার্থক তবলিয়ার মধ্যে কালে খাঁর পুত্র হস্‌সু খাঁ, পৌত্র শম্‌মু খাঁ এবং প্রপৌত্র হবীবুদ্দীন খাঁয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ অজরাড়া ঘরাণার বংশতালিকা ॥
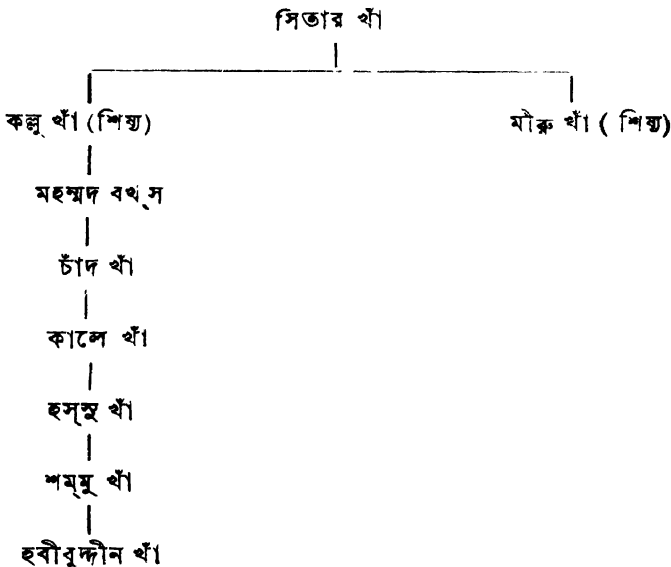
॥ অজরাড়া বাজের বৈশিষ্ট্য ॥

দিল্লী বাজ অজরাড়া বাজের উৎস বলে দিল্লী বাজের বৈশিষ্ট্যের অনেক কিছুই অজরাড়া বাজে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র কায়দাগুলির অপূর্ব প্রয়োগেই এই বাজের বৈশিষ্ট্য। কারণ কায়দাগুলি সাধারণতঃ এই বাজে আড় বা দেড়িয়া লয়ে প্রয়োগেরই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া গৎ, পেশকার পেশকার ইত্যাদিরও রূপ অনেকটা কায়দার মত। দিল্লী বাজের তুলনায় অজরাড়া বাজে বাঁয়ার কাজ অধিক করা হয়।

অজরাড়া বাজের উদাহরণ :

॥ কায়দা ॥

[দেড়িয়া ছন্দ]

(১) ধিন্না ধাগেনে | ধা ধাগেনে | ধাগেতেটে ধাগেতেটে |

দিং দিনাগেনে | ধাগেনে ধাতিক্ | ধাতেটে ধাগেনে |
২

ধাতি ঘেঘেতাক | তিং তিনাকেনে |

তিন্না তাকেনে | তা তাকেনে | তাকেতেটে তাক |
০

তিং তিনাকেনে | ধাগেনে ধাতিক্ | ধেতেটে ধাগেনে |
৩

ধাতি ঘেঘেতাক | দিং দিনাগেনে

॥ কায়দা ॥

[আড়লয়]

(২)	ধাতেটে ধে ×	টে ধাগেনে	ধাড়াঘেনে	ধিনাঘেনে
	ধাতেটে ধে ২	টে ধাগেনে	ধাড়াঘেনে	তিনাকেনে
	তা তেটে তে ০	টে তাকেনে	তাড়াকেনে	তিনাকেনে
	ধা তেটে ধে ৩	টে ধাগেনে	ধাড়া ঘেনে	ধিনা ঘেনে

ষষ্ঠ অধ্যায়

।। দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি ।।

॥ ৭টি প্রাথমিক তাল এবং তাদের জাতি ॥

কর্ণাটকী বা দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কর্ণাটকী তাল পদ্ধতিতে প্রধান হচ্ছে সাতটি তাল। যথা—(১) ধ্রুবতাল, (২) মঠতাল, (৩) রূপকতাল (৪) ঝম্পতাল, (৫) ত্রিপুটতাল, (৬) অঠতাল এবং (৭) একতাল।

এক বা একাধিক মাত্রা বোঝাবার জন্য কর্ণাটকী তালগুলিতে ছয় প্রকার অঙ্গের জন্য ছয় প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। নিম্নে অঙ্গগুলির নামসহ মাত্রা সংখ্যা ও সাংকেতিক চিহ্নগুলি দেওয়া হল।

অঙ্গের নাম	মাত্রা সংখ্যা	চিহ্ন
অনুদ্রুতম্	১	◡
দ্রুতম্	২	o
লঘু	৪	l
গুরু	৮	S
প্লুতম্	১২	ﺩ
কাকপদম্	১৬	×

কর্ণাটকী তালে প্রথম তিনটি অঙ্গের (অনুদ্রুত, দ্রুত এবং লঘু) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, শেষ তিনটি অঙ্গের চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।—

পঞ্চজাতি ভেদ অনুসারে উপরি উক্ত সাতটি তালের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে জাতি। অতএব মোট জাতির সংখ্যা হবে ৭×৫=৩৫

পঞ্চজাতির নাম হচ্ছে যথাক্রমে তিস্রম্, চতস্রম্, খণ্ডম্, মিশ্রম্ এবং সংকীর্ণম্। 'পঞ্চজাতি-ভেদ' অনুসারে লঘুর মাত্রা পরিবর্তিত হয়েই উপর্যুক্ত পাঁচটি জাতি সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—

(১) তিস্র জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা=৩
(২) চতস্রজাতিতে ,, ,, =৪
(৩) খণ্ডজাতিতে ,, ,, =৫
(৪) মিশ্রজাতিতে ,, ,, =৭
(৫) সংকীর্ণজাতিতে ,, ,, =৯

॥ ৭টি তালের ৩৫ প্রকার জাতির তালিকা ॥

তাল	জাতিভেদ	তালচিহ্ন	মাত্রাসংখ্যা
ধ্রুবতাল	তিস্র	1011	৩+২+৩+৩=১১
	চতস্র	1011	৪+২+৪+৪=১৪
	মিশ্র	1011	৭+২+৭+৭=২৩
	খণ্ড	1011	৫+২+৫+৫=১৭
	সংকীর্ণ	1011	৯+২+৯+৯=২৯
মঠতাল	তিস্র	101	৩+২+৩=৮
	চতস্র	101	৪+২+৪=১০
	মিশ্র	101	৭+২+৭=১৬
	খণ্ড	101	৫+২+৫=১২
	সংকীর্ণ	101	৯+২+৯=২০
রূপক তাল	তিস্র	10	৩+২=৫
	চতস্র	10	৪+২=৬
	মিশ্র	10	৭+২=৯
	খণ্ড	10	৫+২=৭
	সংকীর্ণ	10	৯+২=১১

তাল	জাতিভেদ	তালচিহ্ন	মাত্রাসংখ্যা
ঝম্প তাল	ত্রিস্র	1⌣0	৩+১+২=৬
	চতস্র	1⌣0	৪+১+২=৭
	মিশ্র	1⌣0	৭+১+২=১০
	খণ্ড	1⌣0	৫+১+২=৮
	সংকীর্ণ	1⌣0	৯+১+২=১২
ত্রিপুট তাল	ত্রিস্র	100	৩+২+২=৭
	চতস্র	100	৪+২+২=৮
	মিশ্র	100	৭+২+২=১১
	খণ্ড	100	৫+২+২=৯
	সংকীর্ণ	100	৯+২+২=১৩
অঠ তাল	ত্রিস্র	1100	৩+৩+২+২=১০
	চতস্র	1100	৪+৪+২+২=১২
	মিশ্র	1100	৭+৭+২+২=১৮
	খণ্ড	1100	৫+৫+২+২=১৪
	সংকীর্ণ	1100	৯+৯+২+২=২২
একতাল	ত্রিস্র	1	৩
	চতস্র	1	৪
	মিশ্র	1	৭
	খণ্ড	1	৫
	সংকীর্ণ	1	৯

উপরের তালিকায় লক্ষ্যণীয় এই যে প্রতিটি তালে বিভিন্ন জাতিতে তালচিহ্ন একই থাকলেও মাত্রাসংখ্যার হেরফের ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র লঘুর (।) মাত্রাসংখ্যার পরিবর্তনের জন্যই মাত্রা-

সংখ্যার হেরফের ঘটেছে। লঘু ব্যতীত অন্যান্য চিহ্নের মাত্রাসংখ্যাগুলি অপরিবর্তিতই থাকছে।

উপরিউক্ত ৩৫ প্রকারের প্রত্যেকটির আবার ৫টি করে উপবিভাগ আছে; অতএব এই হিসাবে মোট তালের সংখ্যা হবে ৩৫ × ৫ = ১৭৫টি। অর্থাৎ ৭টি তালের পঞ্চ জাতির প্রত্যেকটিতে ৫টি করে উপবিভাগ হলে প্রতেকটি তালের মোট প্রকার হয় ৫ × ৫ = ২৫। এই হিসাবে মোট ৭টি তালের ২৫ × ৭ = ১৭৫টি প্রকার হবে। নিম্নে ত্রিপুট তালের ২৫ প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হল।—

॥ ত্রিপুট তালের ২৫ প্রকার ॥

জাতি	চিহ্ন	মাত্রা	গতি-ভেদ	গতিভেদানুসারে মোট মাত্রা
তিস্র	100	৭	তিস্র .... ৭ × ৩ =	২১
			চতস্র .... ৭ × ৪ =	২৮
			মিশ্র .... ৭ × ৭ =	৪৯
			খণ্ড .... ৭ × ৫ =	৩৫
			সংকীর্ণ ...... ৭ × ৯ =	৬৩
চতস্র	100	৮	তিস্র .... ৮ × ৩ =	২৪
			চতস্র .... ৮ × ৪ =	৩২
			মিশ্র .... ৮ × ৭ =	৫৬
			খণ্ড .... ৮ × ৫ =	৪০
			সংকীর্ণ ...... ৮ × ৯ =	৭২
মিশ্র	100	১১	তিস্র .... ১১ × ৩ =	৩৩
			চতস্র .... ১১ × ৪ =	৪৪
			মিশ্র .... ১১ × ৭ =	৭৭
			খণ্ড .... ১১ × ৫ =	৫৫
			সংকীর্ণ ...... ১১ × ৯ =	৯৯

	গতি-ভেদ		গতিভেদানুসারে মোট মাত্রা
খণ্ড ... 100 ... ৯	তিস্র.........	৯ × ৩	= ২৭
	চতস্র.........	৯ × ৪	= ৩৬
	মিশ্র.........	৯ × ৭	= ৬৩
	খণ্ড	৯ × ৫	= ৪৫
	সংকীর্ণ	৯ × ৯	= ৮১
সংকীর্ণ...100 ... ১৩	তিস্র.........	১৩ × ৩	= ৩৯
	চতস্র.........	১৩ × ৪	= ৫২
	মিশ্র	১৩ × ৭	= ৯১
	খণ্ড	১৩ × ৫	= ৬৫
	সংকীর্ণ	১৩ × ৯	= ১১৭

॥ কর্ণাটকী তাল পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ঠ্য ॥

(১) সাতটি তাল মুখ্য ।

(২) প্রতিটি তালের পাঁচটি করে জাতি এবং মোট জাতির সংখ্যা ৩৫ ।

(৩) প্রত্যেক জাতির আবার পাঁচটি করে বিভাগ নিয়ে মোট ১৭৫ প্রকার তাল উৎপন্ন হতে পারে।

(৪) সব তালই সম হতে আরম্ভ হয় এবং যতগুলি চিহ্ন তত সংখ্যক তালি হবে।

(৫) খালি বা ফাঁক নেই, তবে খালির অনুরূপ 'বিসর্জিতম' আছে।

(৬) জাতিভেদ অনুসারে লঘুর মাত্রা পরিবর্তিত হয়।

॥ কর্ণাটকী তাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে লিখন ॥

নিম্নে ৫টি জাতিতে ধ্রুবতাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে দেখান হল।—

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ১১ (1011) তিস্রজাতি ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ | ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১
× | ২ | ৩ | ৪

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ১৪ (1011) চতস্রজাতি ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ ১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪
× | ২ | ৩ | ৪

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ২৩ (1011) মিশ্র জাতি ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ | ৮ ৯ | ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ |
× | ২ | ৩

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩
৪

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ১৭ (1011) খণ্ড জাতি ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ | ৬ ৭ | ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
× | ২ | ৩ | ৪

॥ ধ্রুবতাল, মাত্রা ২৮ (1011) সংকীর্ণজাতি ॥

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ | ১০ ১১ | ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ |
× | ২ | ৩

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮
৪

উপরি উক্ত নিয়মে প্রত্যেকটি কর্ণাটকী তাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে লেখা চলবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে লঘুর মাত্রানুযায়ী একই তালের বিভিন্ন জাতিতে মাত্রাসংখ্যা পরিবর্তিত হয় এবং তাল বিভাগও সেই নিয়মে করা হয়েছে।

॥ হিন্দুস্থানী তাল কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লিখন ॥

হিন্দুস্থানী তালগুলিকে কর্ণাটকী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হলে খালি বা ফাঁকের বিভাগ—পূর্ববর্তী তালির বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে, কারণ আমরা পূর্বে বলেছি যে কর্ণাটকী তাল পদ্ধতিতে খালি বা ফাঁক নেই। নিম্নে কয়েকটি হিন্দুস্থানী তাল ঠেকা সহ কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লিখে দেখান হল।—

চৌতাল, মাত্রা ১২ (1100) ৪টি বিভাগ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দেন্	তা	কৎ	তাগে	দেন	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে
×				২				৩		৪	

॥ সুলতাল, ১০ মাত্রা (101) ৩টি বিভাগ ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা	দেন	তা	কিট	ধা	তিট	কত	গদি	ঘেনে
×				২		৩			

॥ আড়া চৌতাল, ১৪ (0111) ৪টি বিভাগ ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধিন	ধিন	ধাগে	ত্রেকেটে	তু	না	ক	ত্তা	ধিন	ধিন	না	ধিন	ধিন	না
×		২				৩				৪			

॥ ত্রিতাল, ১৬ মাত্রা (1S1), ৩টি বিভাগ ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তেটে	ধিন	ধিন	ধা
×				২								৩			

কাঁরও কাঁরও মতে হিন্দুস্থানী তালকে কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লিখতে হলে হিন্দুস্থানী তাল যতগুলি বিভাগ-সমন্বিত হবে সবগুলিই বিভাগই দেখাতে হবে। নিম্নে প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় মতানুযায়ী কয়েকটি হিন্দুস্থানী তাল কর্ণাটকী পদ্ধতিতে কেবলমাত্র চিহ্ন-সহযোগে লিখে দেখান হল।—

তাল	প্রথম মত	দ্বিতীয় মত
আড়া চৌতাল	0111	0000000
ঝাঁপতাল	01̆ 0̆	00̆00̆
ধামার	01̆1	1̆00̆1
ত্রিতাল	IS1	1111

।। কর্ণাটকী তালের মুখ্য চার বিষয় ।।
।। কাল, অঙ্গ, জাতি, বিসর্জীতম্ ।।

উত্তর ভারতীয় তাল-পদ্ধতি হতে কর্ণাটকী তাল পদ্ধতি জটিল। প্রাচীন কর্ণাটকী ১০৮ প্রকার তাল পদ্ধতি থেকে মুখ্য ৭টি তাল এবং প্রতি তালের পঞ্চজাতি ভেদ অনুসারে ৩৫টি তাল সৃষ্টি হয়েছে। এই ৩৫ টির আবার পাঁচটি করে বিভাগ নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৫টি। তবে এই তাল পদ্ধতি যতই জটিল হোক এর চারটি প্রধান বিষয় উল্লেখযোগ্য। যথা—কাল বা প্রমাণ, অঙ্গ, জাতি এবং বিসর্জীতম্।

।। কাল বা প্রমাণ ।।

সংগীতে ব্যবহৃত সময়কে কাল বা প্রমাণ বলে। সময়কে বিভিন্ন মাত্রাদ্বারা নিবদ্ধ করে তালের কাঠামো গঠিত হয়। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে সময়কে পরিমাপ করবার জন্য দুইটি পদ্ধতির প্রচলন আছে, যথা—মাত্রা এবং অক্ষর কাল। ৪ মাত্রা = ১ অক্ষরকাল। বর্তমানে অক্ষরকাল কর্ণাটকী তাল পদ্ধতিতে প্রচলিত।

।। অঙ্গ ।।

তাল বিভাগকেই কর্ণাটকী পদ্ধতিতে অঙ্গ বলা হয় এবং অঙ্গের সংখ্যা ছয়টি—অনুদ্রুতম্; দ্রুতম্, লঘু, গুরু, প্লুতম্ এবং কাকপদম্। প্রত্যেকটির মাত্রা সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১, ২, ৪, ৮, ১২ এবং ১৬।

॥ জাতি ॥

তালের মাত্রা সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে কর্ণাটকী পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছে। জাতির সংখ্যা পাঁচটি ত্রিশ্রম, চতুশ্রম, মিশ্রম্, খণ্ডম্ এবং সংকীর্ণম্। বিভিন্ন জাতির লঘুর মাত্রাসংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে ত্রিশ্রমে ৩, চতশ্রমে ৪, মিশ্রমে ৭, খণ্ডমে ৫ এবং সংকীর্ণমে হয় ৯। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে লঘু ব্যতীত অন্য সকল অঙ্গের মাত্রাসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

॥ বিসর্জিতম্ ॥

কর্ণাটকী পদ্ধতিতে ফাঁককে বলা হয় বিসর্জিতম্ বা বিচ্‌চে এবং তালাঘাতকে বলা হয় আতি। দ্রুত অঙ্গের দ্বিতীয় মাত্রায় বিসর্জীতম্ প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বিসর্জিতম্ তিন প্রকার,

যথা ঃ—পতাকম্, কৃষয় এবং সর্পিনী।

পতাকম্—হস্ত উর্দ্ধাভিমুখী করা।

কৃষয়—বামদিকে হস্ত প্রদর্শন।

সর্পিনী—দক্ষিণদিকে হস্ত প্রদর্শন।

সপ্তম অধ্যায়

॥ তবলা বাদকের গুণ ও অবগুণ ॥

তবলা বাদনে সফলতা অর্জন করতে হলে একদিকে যেমন কতকগুলি গুণের অধিকারী হতে হবে অন্যদিকে তেমনই দোষ গুলি পরিহার করতে হবে। নিম্নে তবলা বাদকের গুণ ও দোষগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

॥ তবলা বাদকের গুণ ॥

(১) হৃদ্য শব্দ— যাঁর বোল বা বর্ণগুলি সুস্পষ্ট এবং শ্রুতিমধুর।

(২) সুসম্প্রদায়— যিনি গুরু-পরম্পরায় উচ্চ শ্রেণীর বাদক।

(৩) ক্রিয়াপর— নিয়মিত অভ্যাস করে যিনি হস্তকৌশল উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন।

(৪) সর্বগুণ সমন্বিত—যাঁর বাদন পদ্ধতি ত্রুটিহীন।

(৫) ধারণান্বিত— যাঁর ধারণাশক্তি তথা স্মৃতিশক্তি প্রখর।

(৬) লয়দার— যিনি বিশেষরূপে লয়ে পারদর্শী।

(৭) উন্মেষশালী— যিনি বাদ্যকালে প্রয়োজন মত নতুন সৃষ্টিকার্যে সক্ষম।

(৮) জিতশ্রম— যিনি অল্পেতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন না।

(৯) তালজ্ঞ— তাল সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ।

(১০) সতর্ক— যিনি সতর্কতার সঙ্গে বাদ্য পরিবেশন করেন।

(১১) লোককান্ত— যাঁর বাদন-শৈলী বা বাদন কৌশলে জনচিত্ত মুগ্ধ হয়।

(১২) পরিমিত— যিনি সংগতের সময় প্রয়োজন মত ছোট বা বড় কায়দা, রেলা—ইত্যাদির প্রয়োগ করেন।

(১৩) শোভন— যিনি সঠিকভাবে উপবেশন করেন এবং কোনরূপ বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করেন না।

(১৪) প্রসন্ন— যিনি সদা প্রসন্ন অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই বিরক্ত হন না।

(১৫) পণ্ডিত— ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াত্মক অংশে যাঁর সমান দক্ষতা।

(১৬) সর্বসঙ্গত পারদর্শী— যিনি গীত, বাদ্য এবং নৃত্যে সমভাবে সঙ্গতে পারদর্শী।

(১৭) ত্রিগুণাধিকারী—যিনি বিনয়ী, শ্রদ্ধাবান এবং জ্ঞানান্বেষী।

(১৮) বাদ্য বিষয় কৌশলী—বাদনের সকল বিষয়ে যাঁর দক্ষতা আছে—অর্থাৎ যিনি সকল কৌশল সম্বন্ধে অবহিত।

(১৯) নির্মান শিল্পজ্ঞ— তবলা বাঁয়ার গঠন কার্য সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে।

(২০) সুরজ্ঞ— যিনি সঠিক সুরে তবলা বাঁধতে পারেন।

(২১) বাদ্যেত্তর সঙ্গীতনিপুন—সংগীতের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে যাঁর কিছু জ্ঞান আছে।

॥ তবলা বাদকের অবগুণ ॥

(১) কুণ্ঠিত অঙ্গুলী— যিনি অংগুলি সহজভাবে প্রয়োগ করেন না।

(২) অশোভন— যিনি সঠিকভাবে উপবেশন করেন না।

(৩) সন্ত্রস্তচিত্ত সংগতী— যিনি সন্ত্রস্তচিত্তে সংগত করেন।

(৪) বেলয়ী— যাঁর লয় অসমান।

(৫) নিরস বাদক— যাঁর বাদ্য কর্কশ, শ্রুতিমধুর নয়।

(৬) হৃস্তশব্দহীন— যাঁর বর্ণ বা বোলগুলি অস্পষ্ট।

(৭) অশ্রুত প্রায় ধ্বনি— যাঁর আওয়াজ স্পষ্ট এবং জোরদার নয়।

(৮) তাল প্রক্রিয়াহীন— যিনি তালাদির প্রক্রিয়া গুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন।

(৯) নিমীলিত চক্ষুবাদক— যিনি নিমীলিত চক্ষে বাজান

(১০) অনাবিষ্ট বাদক— যিনি তাল-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন না।

(১১) চঞ্চলচিত্ত— বাদ্যে যিনি মনোনিবেশ করতে পারেন না।

(১২) বেসুরা— যাঁর সুরজ্ঞান্ নেই।

(১৩) অপরিমিতি বোদ্ধা— যাঁর পরিমিতি-বোধের অভাব।

(১৪) অপ্রসন্নচিত্ত বাদক— যিনি অপ্রসন্ন চিত্তে বাজান।

(১৫) স্বেচ্ছাচারী— যিনি বাজনার নিয়ম-কানুন মানেন না।

(১৬) সুসম্প্রদায় হীন— যিনি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে তালিম নেন নি।

(১৭)-অকৃতবিদ্য সঙ্গতকার—যিনি সংগীতের সর্ববিভাগে সংগতে অপারগ।

(১৮) কুসঙ্গতী— যিনি উত্তম সংগতকার নন।

অষ্টম অধ্যায়

লয়, লয়ের প্রকার ও লয়কারী

॥ লয় ॥

সংগীতে যা গতির সমতা রক্ষা করে তাকে বলা হয় লয়। 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে লয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে

"ক্রিয়ান্তর বিশ্রান্তিলয়ঃ।"

অর্থাৎ লয় হচ্ছে ক্রিয়ার অন্তে বিশ্রান্তি।—

'অমর কোষ' গ্রন্থে গীতবাদ্যের পদাভ্যন্তরে ক্রিয়া এবং কালের-পরস্পরের সমতাকে লয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।—

"গীত বাদ্য পাদন্যাসাপাং ক্রিয়াকালোয় পরস্পরং সমতা লয়।" সংগীত এবং লয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। কারণ লয়হীন সংগীত প্রাণহীন।

॥ লয়ের রূপ ও প্রকার ॥

গতির পরিমাপ অনুসারে লয়কে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত। তবে সংগীতে গতির প্রকার নিয়ে নানা মত আছে। কোনও মতে দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত অংশের মধ্যে আবার তিনটি করে উপবিভাগ আছে। সংগীত রত্নাকরকার ছয় প্রকার গতির উল্লেখ করেছেন, যথা দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত, দ্রুত মধ্য, দ্রুত বিলম্বিত এবং মধ্যবিলম্বিত। পাশ্চাত্য সংগীতেও ছয় প্রকার গতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা :

১। Auegro—দ্রুত

২। Adante—মধ্য

৩। Zargo—বিলম্বিত

৪। Presto—দ্রুতমধ্য

৫। Vino—দ্রুত বিলম্বিত

৬। Moderate—মধ্য বিলম্বিত

বিভিন্ন লয়ের সময় অর্থাৎ স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। "সংগীত তরঙ্গ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে—একে দ্রুত, দুয়ে মধ্য, তিনে বিলম্বিত। সাধারণভাবে বিলম্বিত লয়ের দ্বিগুনকে মধ্যলয় এবং মধ্যলয়ের দ্বিগুণকে দ্রুতলয় হিসাবে ধরা হয়।

বর্তমানে রূপ ও প্রকার অনুসারে লয়কে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: অতি-বিলম্বিত, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত, অনুদ্রুত লয়। তাছাড়া লয়ের গতির রূপান্তরণ ঘটিয়ে তাকে দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়ী, কুআড়ী, বিআড়ী লয় বলা হয়। নিম্নে প্রত্যেক প্রকার লয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

অতি—বিলম্বিত: মন্থরতর গতিকে বলা হয় অতি বিলম্বিত লয়। যেমন বিলম্বিত লয়ের প্রতিটি মাত্রায় স্থায়িত্বকাল যদি ২ সেকেণ্ড হয় তাহলে অতি-বিলম্বিত লয়ের প্রতিটি মাত্রায় স্থায়িত্ব কাল হবে ৪ সেকেণ্ড।

বিলম্বিত: মন্থর গতিকে বলা হয় ঢিমা বা বিলম্বিত লয়। সাধারণতঃ মধ্যলয়ের দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি মাত্রায় ২ সেকেণ্ড পরিমাণ মত সময়কে বিলম্বিত লয়ের স্থায়িত্বকাল ধরা হয়।

মধ্য: সহজ এবং স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে মধ্যলয় এবং প্রতি মাত্রায় ১ সেকেণ্ড পরিমাণ মত সময় এর স্থায়িত্বকাল ধরা হয়।

দ্রুত: জলদ বা ত্বরিৎ গতিসম্পন্ন লয়কে বলা হয় দ্রুতলয় এবং বর্তমানে প্রতি মাত্রায় ১/২ সেকেণ্ড পরিমাণ মত সময় দ্রুতলয়ের স্থায়িত্বকাল বলে নির্দেশ করা হয়।

অনুদ্রুত : অতি জলদ বা অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন লয়কে বলা হয়। অনুদ্রুত লয়। দ্রুত লয়ের দ্বিগুণ গতিতে অনুদ্রুত লয় বাজান হয়। অর্থাৎ অনুদ্রুত লয়ে প্রতিটি মাত্রার স্থায়িত্বকাল ১/৪ সেকেণ্ড সময় মাত্র।

দ্বিগুণ : যে সময়ের মধ্যে একটি মাত্রা স্বর বা বর্ণ বাজান বা উচ্চারিত হয় সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ের মধ্যে দুইটি মাত্রা স্বর, বা বর্ণ বাজান বা উচ্চারিত হলে তাকে বলা হয় দ্বিগুণ লয়। যেমন—

সংখ্যা :	একগুণ—	১	২	৩	৪
	দ্বিগুণ—	১২	৩৪	১২	৩৪

বর্ণ :	একগুণ—	ধা	ধিন	ধিন	ধা
	দ্বিগুণ—	ধাধিন	ধিনধা	ধাধিন	ধিনধা

তিনগুণ : নির্দিষ্ট একটি মাত্রার সময়ের মধ্যে তিনটি মাত্রা, স্বর বা বর্ণ বাজান বা উচ্চারিত করা হলে তিনগুণ লয় বলা হয়। যেমন—

একগুণ :—	সংখ্যা—	১	২	৩
	বর্ণ—	ধা	ধি	না
তিনগুণ :	সংখ্যা—	১২৩	১২৩	১২৩
	বর্ণ—	ধাধিনা	ধাধিনা	ধধিনা

চৌগুণ : যে সময়ের মধ্যে একটি মাত্রা, বর্ণ বা স্বর বাজান বা উচ্চারিত হয়, সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চারটি মাত্রা, বর্ণ বা স্বর বাজান বা উচ্চারণ করাকে বলা হয় চৌগুণ লয়। যেমন—

একগুণ :	সংখ্যা—	১	২	৩	৪
	বর্ণ—	ধা	ধি	না	ধি
চারগুণ :	সংখ্যা—	১২৩৪	১২৩৪	১২৩৪	১২৩৪
	বর্ণ—	ধাধিনাধি	ধাধিনাধি	ধাধিনাধি	ধাধিনাধি

আড়ী : দেড়গুণ গতির ছন্দ অর্থাৎ নির্দিষ্ট দুই মাত্রা সময়ের মধ্যে তিনটি মাত্রা অথবা এক মাত্রার স্থায়িত্ব কালের মধ্যেই দেড় মাত্রার প্রয়োগ হলে বলা হয় আড়ী লয়। যথা :

একগুণ :	সংখ্যা—	১	২	৩	৪
	বর্ণ—	ধা	ধি	না	তি
দেড়গুণ :	সংখ্যা—	১ऽ২	ऽ৩ऽ	৪ऽ৫	ऽ৬ऽ
	বর্ণ—	ধাऽধি	ऽনাऽ	তিऽধা	ऽধিऽ

কুআড়ী : সোওয়াগুণ গতির ছন্দ অর্থাৎ চার মাত্রা সময়ের মধ্যে পাঁচটি মাত্রার প্রয়োগ (৫/৪) হলে তাকে বলা হয় কুআড়ী লয়। যথা :

সংখ্যা :	১	২	৩	৪
বর্ণ :	ধা	ধি	ধি	না
সংখ্যা :	১ऽऽऽ২	ऽऽऽ৩ऽ	ऽऽ৪ऽऽ	ऽ৫ऽऽऽ
বর্ণ :	ধাऽऽऽধি	ऽऽऽধিऽ	ऽऽধিऽऽ	ऽনাऽऽऽ

আবার চার মাত্রা সময়ের মধ্যে ৯ মাত্রার (৯/৪) প্রয়োগ হলে তাকেও বলা হয় কুআড়ী লয়। যথা :

সংখ্যা :	১	২	৩	৪
বর্ণ :	ধা	ধি	ধি	না
সংখ্যা :	১ऽऽऽ২ऽऽऽ৩	ऽऽऽ৪ऽऽऽ৫ऽ	ऽऽ৬ऽऽऽ৭ऽऽ	ऽ৮ऽऽऽ৯ऽऽऽ
বর্ণ :	ধাऽऽऽধিऽऽऽধি	ऽऽऽনাऽऽऽধাऽ	ऽऽऽনাऽऽऽধিऽऽ	ऽনাऽऽऽধিऽऽऽ

বর্তমানে প্রথমোক্ত প্রকারটির ($\frac{৫}{৪}$) প্রচলনই সর্বাধিক এবং দ্বিতীয় প্রকারটি ($\frac{৯}{৪}$) অপ্রচলিত।

বিআড়ী : পৌনে দুই গতির ছন্দ অর্থাৎ আট-এর সাতাশগুণ(২$\frac{৮}{৭}$) অথবা সাতের চারগুণ ($\frac{৭}{৪}$) লয়কে বলা হয় বিআড়ী লয়। অর্থাৎ এই লয়ে আট মাত্রা সময়ের মধ্যে সাতাশ মাত্রা অথবা চার মাত্রা সময়ের মধ্যে সাত মাত্রার প্রয়োগ হয়ে থাকে। —বর্তমানে দ্বিতীয় প্রকারটির ($\frac{৭}{৪}$) প্রচলন অধিক, তাই নিম্নে দ্বিতীয় প্রকারটির উদাহরণ দেওয়া হল।—

সংখ্যা :	১	২	৩	৪
	১SSS২SS	S৩SSS৪S	SS৫SSS৬	SSS৭SSS
বর্ণ :	তি	না	ধি	না
	তিSSSনাSS	Sধিসssনাs	SSতিSSSনা	SSSধিSSS

॥ লয়কারী ॥

লয়কারী অর্থ লয় বৈচিত্র্য। লয়কারীতে একটি লয়কে বিভিন্ন ছন্দে রূপায়িত করে প্রয়োগ করা হয়। এই ছন্দান্তর দ্বারা আলঙ্কারিক ক্রিয়াগুলির অভিনবত্ব আনয়ন করা হয়। ছন্দ পরিবর্তন না করলে অর্থাৎ একই ছন্দে গতায়াত করলে তা হবে বৈচিত্র্যহীন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মত দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙ্গে দিলে ছন্দের গৌরব আরও বাড়ে।"

ছন্দ দুই প্রকার—সম ও বিষম। বিষম ছন্দের দ্বারাই ছন্দবৈচিত্র্য-ক্রিয়া সাধিত হয়। বিষম ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে—তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি আর এক অংশে বাধা, এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তাহার নৃত্য।.. এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হইত, তাহা হইলে ছন্দ হইত না। এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরও উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্রময় করে তোলে। এইজন্য অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রায় ছন্দের গতিকে যেন আরও বেশী অনুভব করা যায়।".

সমভাবে বা যুগ্মভাবে গঠিত স্বর, বর্ণ বা মাত্রাকে বলা হয় সমছন্দ এবং অযুগ্ম স্বর, বর্ণ বা মাত্রা সমাবেশকে বলা হয় সমছন্দ। সমছন্দে গতি হয় সরল, বিষম ছন্দে বক্র। দুইগুণ, চারগুণ, আটগুণ, ইত্যাদি সমছন্দের উদাহরণ এবং দেড়গুণ, সোয়াগুণ ইত্যাদিকে বলা হয় বিষম ছন্দ।

"সঙ্গীতে ছন্দ বৈচিত্র্য আনয়ন হয় নিম্নলিখিত ক্রিয়াদ্বারা, যথা —গতি পরিবর্ত্তন, মাত্রার বিরাম অথবা অক্ষর উচ্চারণের স্থায়িত্ব এবং স্বর বা বোলের প্রবল উচ্চারণ—ভঙ্গী। সঙ্গীত ছন্দের গতি পরিবর্ত্তন বহুভাবে করা যায়, কিন্তু সাধারণতঃ সোওয়া দেড়ী,; পৌনে দুই ও দুইগুণ গতির ব্যবহারই বেশী হয়, অনেক ক্ষেত্রে উক্ত গতিগুলি দ্বিগুণ বা চতুর্গুণও হয়। যেমন সোওয়ার দ্বিগুণ আড়াইয়া, চতুর্গুণ পাঁচ, এইপ্রকার দেড়ীর দ্বিগুণ, তিন, চতুর্গুণ হয়, পৌনে দুই এর দ্বিগুণ সাড়ে তিন, চতুর্গুণ সাত, দুই'এর দ্বিগুণ চার, চতুর্গুণ আট (আটগুণকে অনেকে পরদুন বলেন)।" [ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ— শ্রী সুবোধ নন্দী, পৃঃ ৯৪/৯৫]।

॥ লয়কারী লিখবার নিয়ম ॥

দ্বিগুণ, তিনগুণ বা চারগুণ লয়কারী লেখা সহজ, কিন্তু ভগ্নাংশ হলে অর্থাৎ $১\frac{১}{৯}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৪}{৩}$ ইত্যাদি ক্ষেত্রে লয়কারী লিখবার একটি সহজ নিয়ম উল্লিখিত হল।

প্রথমতঃ যত গুণের লয়কারী লিখতে হবে সেই অংকের উপরের সংখ্যাটির (লব) একক হতে সেই সংখ্যা পর্যন্ত প্রত্যেকটির সঙ্গে নিম্নের সংখ্যার (হর) একটি কম [অর্থাৎ ৩ হলে ২টি করে, ৪ হলে ৩টি করে] অবগ্রহ যুক্ত করতে হবে। তারপর মোট সংখ্যাকে নীচের সংখ্যাটি দ্বারা (হর) ভাগ দিলে নির্ণেয় লয়কারী বের হবে।

উদাহরণ :—

৪/৩ গুণ অর্থাৎ তিন মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চার মাত্রার প্রয়োগ দেখাতে হবে।

উপরের সংখ্যাটি (লব)=৪

অতএব ১ হতে ৪ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে নিম্নের সংখ্যা (হর) ৩ হতে একটি কম (৩—১=২) অর্থাৎ দুইটি করে অবগ্রহ (*s*) যুক্ত করলে সংখ্যা এবং অবগ্রহ নিয়ে মোট হবে ১২টি। যথা—

১*ss* ২*ss* ৩*ss* ৪*ss* ।

এইবার ৩ (হর) দ্বারা ১২কে বিভক্ত করলে প্রতি বিভাগে সংখ্যা এবং অবগ্রহ নিয়ে মোট ৪টি করে হবে।

১	২	৩
১*ss*৩	*ss*৩*s*	*s*৪*ss*

∴ ৩ মাত্রার প্রয়োগের মধ্যে ৪ মাত্রার প্রয়োগ হল।

নিম্নে লয়কারীর কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা মাত্রা পরিমাণ এবং বর্ণের পূর্বে বা পরে অবগ্রহ (S) প্রয়োগ দ্বারা মাত্রা সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটান হয়েছে।

।। একগুণ (ঠায় বা বরাবর লয়) ।।

প্রতিটি মাত্রায় মাত্র একটি করে বর্ণের প্রয়োগ হলে তাকে ঠায় বা বরাবর লয় বলা হয়। যথা—

১	২	৩	৪
ধা	ধি	ধি	না

॥ আড় বা দেড়গুণ (১½) ॥

একমাত্রা সময়ের মধ্যে দেড় (১½) মাত্রার প্রয়োগ হলে অথবা দুইমাত্রা সময়ের মধ্যে তিন মাত্রার প্রয়োগ হলে তাকে বলা হয় আড়লয়।

১				২	
১	ঽ	২	ঽ	৩	ঽ
ধা	ঽ	ধি	ঽ	না	ঽ

॥ দুইগুণ ॥

একটি মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে দুটি মাত্রার সমাবেশকে দুইগুণ বলা হয়।

একগুণ :	১	২	৩	৪
	ধা	ধি	ধি	না
	১২	৩৪		
দুইগুণ :	ধাধি	ধিনা		

এখানে ৪টি মাত্রাকে দুইগুণ করবার জন্য ২ মাত্রার মাত্রার মধ্যেই চার মাত্রার প্রয়োগ সম্পূর্ণ হয়েছে।

॥ অর্দ্ধগুণ ॥

দুটি মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে একটি মাত্রার প্রয়োগ করা হলে অর্দ্ধগুণ বলা হয়।

একগুণ :	১	২	৩	৪
	ধা	ধি	ধি	না
অর্দ্ধগুণ :	১ ঽ	২ ঽ	৩ ঽ	৪ ঽ
	ধা ঽ	ধি ঽ	ধি ঽ	না ঽ

॥ তিনগুণ ॥

একটি মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে তিনটি মাত্রার প্রয়োগ করা হলে তাকে বলা হয় তিণগুণ।

একগুণ :	১	২	৩	৪	৫	৬
	ধা	ধি	না	না	তি	না

তিনগুণ :	১ ২ ৩	৪ ৫ ৬
	ধাধিনা	নাতিনা

॥ চৌগুণ বা চারগুণ ॥

একটি মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চারটি মাত্রার প্রয়োগ করা হলে তাকে বলে চারগুণ।

একগুণ :	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ধা	ধি	ধি	না	না	তি	তি	না

৪গুণ :	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭ ৮
	ধাধিধিনা	নাতিতিনা

॥ পাঁচগুণ, ছয়গুণ, সাতগুণ এবং আটগুণ ॥

দুগুণ, তিনগুণ এবং চারগুণের মতই একটি মাত্রার প্রয়োগ সময়ের সময়ের মধ্যে ৫টি, ৬টি, ৭টি এবং ৮টি মাত্রার প্রয়োগ করা হলে তাদের বলা হয় যথাক্রমে পাঁচগুণ, ছয়গুণ, সাতগুণ বা আটগুণ।

॥ দুইয়ের তিন গুণ (২/৩) ॥

তিন মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে দুই মাত্রার প্রয়োগ করা হলে অর্থাৎ এক মাত্রার মধ্যে ২/৩ মাত্রার প্রয়োগ হলে বলা হয় দুয়ের তিনগুণ (২/৩)।

১	২	৩
১ঽ	ঽ২	ঽঽ

॥ তিনের-চারগুণ ($\frac{৩}{৪}$) বা পৌনগুণ ॥

চারমাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে তিন মাত্রার প্রয়োগ করা হলে তাকে বলা হয় তিনের-চারগুণ ($\frac{৩}{৪}$) বা পৌনগুণ। উপরি উক্ত নিয়ম অনুসরণ করে চারটি মাত্রার প্রতিটির সঙ্গে দুইটি করে অবগ্রহ (ऽ) সংযুক্ত করে যে চারটি মাত্রা হবে তাকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনের চারগুণ ($\frac{৩}{৪}$) লিখতে হবে।

১	২	৩	৪
১ ऽ ऽ	ऽ ২ ऽ	ऽ ऽ ৩	ऽ ऽ ऽ
ধা ऽ ऽ	ऽ ধি ऽ	ऽ ऽ না	ऽ ऽ ऽ

॥ চারের তিনগুণ ($\frac{৪}{৩}$) ॥

তিন মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চার মাত্রার প্রয়োগ হয়। উপরি উক্ত নিয়মে—

১	২	৩
১ ऽ ऽ ২	ऽ ऽ ৩ ऽ	ऽ ৪ ऽ ऽ
ধা ऽ ऽ ধি	ऽ ऽ ধি ऽ	ऽ না ऽ ऽ

॥ চারের পাঁচগুণ ($\frac{৪}{৫}$) ॥

পাঁচটি মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চারটি মাত্রার প্রয়োগ হয়। যেমন—

১	২	৩	৪	৫
১ ऽ ऽ ऽ	ऽ ২ ऽ ऽ	ऽ ऽ ৩ ऽ	ऽ ऽ ऽ ৪	ऽ ऽ ऽ ऽ
ধা ऽ ऽ ऽ	ऽ ধি ऽ ऽ	ऽ ऽ ধি ऽ	ऽ ऽ ऽ না	ऽ ऽ ऽ ऽ

॥ চারের সাতগুণ ($\frac{৪}{৭}$) ॥

সাত মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে চার মাত্রার প্রয়োগ হয়। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ s s s s s s ২ s s s s s s ৩ s s s s s s ৪ s s s s s s

ধা s s s s s s ধি s s s s s s ধি s s s s s s না s s s s s s

॥ পাঁচের চারগুণ (৫/৪) বা কুআড় লয় ॥

চার মাত্রা প্রয়োগ সময়ের মধ্যে পাঁচ মাত্রার প্রয়োগ হলে তাকে বলা হয় পাঁচের চারগুণ (৫/৪), সওয়াগুণ বা কুআড় লয়। যেমন—

১ ২ ৩ ৪

১ s s s ২ s s s ৩ s s s ৪ s s s ৫ s s s

ধা s s s ধি s s s ধি s s s না s s s ধা s s s

চার মাত্রা প্রয়োগ সময়ের মধ্যে নয়টি মাত্রার প্রয়োগ হলে তাকেও কুআড় লয় বলা হয়, তবে বর্তমানে এই প্রকার কুআড় লয় প্রচলিত নয়।

॥ ছয়ের চারগুণ (৬/৪) ॥

চার মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে ছয় মাত্রার প্রয়োগ হবে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪

১sss২s ss৩sss ৪sss৫s ss৬sss

ধাsssধিs ssনাsss নাsssতিs ssনাsss

সাতের চারগুণ (৭/৪) পৌনে দুগুণ (১৩/৪) বা আড়লয়

চার মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে সাত মাত্রার প্রয়োগ হলে তাকে বলা হয় সাতের চারগুণ (৭/৪), পৌনে দুগুণ (১৩/৪) বা বিআড় লয়। যেমন—

১ ২ ৩ ৪

১sss২ss s৩sss৪s ss৫sss৬ sss৭sss

ধাsssধিss sধিsssনাs ssধাsssধি sssনাsss

আট মাত্রার প্রয়োগ সময়ের মধ্যে সাতাশ মাত্রার প্রয়োগ ($\frac{২৭}{৮}$) হলে তাকেও বিআড় লয় বলা হয়, কিন্তু এই ধরণের প্রয়োগ বর্তমানে অপ্রচলিত।

॥ গাণিতিক পদ্ধতিতে লয়কারী আরম্ভের স্থান নির্ণয় ॥

পূর্বে বিভিন্ন মাত্রার লয়কারী লিখবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এইবার আমরা লয়কারী আরম্ভ করবার পদ্ধতি সম্বন্ধে অর্থাৎ বিভিন্ন মাত্রাসংখ্যা যুক্ত তালগুলির কোন মাত্রা হতে লয়কারীর কাজ আরম্ভ করতে হবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দুইগুণ, তিনগুণ কিংবা চারগুণ ইত্যাদির লয়কারীর ক্ষেত্রে অনেকে বিশেষ তালটিকে দুইবার, তিনবার এবং চারবার করে লিখে দেখান। এর মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই। সেই জন্য প্রতিটি লয়কারীর কাজ এখানে এক আবর্তনের মধ্যেই দেখান হবে।

লয়কারী আরম্ভের স্থান নির্ণয় করতে গেলে দুইটি বিষয় জানতে হবে।—

(১) নির্ণেয় তালটির মাত্রাসংখ্যা

এবং (২) কতগুণের লয়কারী।

নির্ণেয় তালটির মাত্রাসংখ্যাকে যতগুণের লয়কারীতে দেখাতে হবে সেই সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ দিলে পাওয়া যাবে মোট কত মাত্রার মধ্যে তালটির লয়কারী সমাপ্ত হবে এবং যত মাত্রার মধ্যে লয়-কারীর কাজ শেষ হবে সেই সংখ্যাটিকে তালের মাত্রা সংখ্যা হতে বিয়োগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, তারপর থেকেই লয়কারী সুরু হবে।

যেমন, একটি ১০ মাত্রা সংখ্যা সম্পন্ন তালকে ১$\frac{১}{২}$ গুণ করলে কত

মাত্রার মধ্যে এক আবর্তনে লয়কারীর কাজ শেষ করা যাবে?

$$১০ \div ১\frac{১}{২} = ১০ \times \frac{২}{৩} = \frac{২০}{৩} = ৬\frac{২}{৩}$$

∴ $৬\frac{২}{৩}$ মাত্রার মধ্যে তালটির দেড়গুণ লয়কারীর কাজ শেষ হবে। ১০ থেকে (নির্ণেয় তালটির মাত্রাসংখ্যা) এই সংখ্যাটি অর্থাৎ $৬\frac{২}{৩}$ কে বিয়োগ করলে কত মাত্রার পর থেকে নির্দিষ্ট লয়কারীর কাজ আরম্ভ করতে হবে সেই সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। যেমন—

$$১০ - ৬\frac{২}{৩} = ৩\frac{১}{৩}$$

∴ $৩\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর থেকে ১০ মাত্রার তালের দেড়গুণ লয়কারীর কাজ আরম্ভ করতে হবে। যেমন—

১ ২ ৩ S১S ২S৩ S৪S ৫S৬ S৭S ৮S৯ S১০S।

নিম্নে উপরিউক্ত হিসাবানুসারে ১৬ মাত্রার তালকে বিভিন্ন লয়-কারীতে লিখতে হলে কত মাত্রা থেকে আরম্ভ করতে হবে তা দেখান হল।

॥ দুইগুণ ॥

$$১৬ - \frac{১৬}{২} = ৮$$

∴ ৯ মাত্রা থেকে দুইগুণ আরম্ভ করতে হবে। ১৬ — ৮ = ৮ মাত্রার মধ্যে দুইগুণ সমাপ্ত হবে।

॥ তিনগুণ ॥

$$১৬ - \frac{১৬}{৩} = ১০\frac{২}{৩}$$

∴ $১০\frac{২}{৩}$ মাত্রার পর থেকে তিনগুণ আরম্ভ হবে। $১৬ - ১০\frac{২}{৩} = ৫\frac{১}{৩}$ মধ্যে তিনগুণ সমাপ্ত হবে।

॥ চারগুণ ॥

$$১৬—\frac{১৬}{৪}=১২$$

∴ ১৩ মাত্রা হতে চারগুণ আরম্ভ হবে। ১৬—১২=৪ মাত্রার মধ্যে চারগুণ সমাপ্ত হবে।

॥ আড়লয় ॥

$$১৬—(১৬\times\frac{২}{৩})=৫\frac{১}{৩}$$

∴ $৫\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর থেকে আড়লয় আরম্ভ হবে। $১৬—৫\frac{১}{৩}=১০\frac{২}{৩}$ মাত্রার মধ্যে আড়লয় সমাপ্ত হবে।

॥ কুআড় লয় ॥

$$১৬—(১৬\times\frac{৪}{৫})=৩\frac{১}{৫}$$

∴ $৩\frac{১}{৫}$ মাত্রার পর থেকে কুআড় লয় আরম্ভ হবে। $১৬-৩\frac{১}{৫}=১২\frac{৪}{৫}$ মাত্রার মধ্যে কুআড় লয় সমাপ্ত হবে।

॥ বিআড় লয় ॥

$$১৬—(১৬=\frac{৪}{৭})=৬\frac{৬}{৭}$$

∴ $৬\frac{৬}{৭}$ মাত্রার পর থেকে বিআড় লয় আরম্ভ হবে। ১৬—৬ $=৯\frac{১}{৭}$ মাত্রার মধে বিআড় লয়ে সমাপ্ত হবে।

নবম অধ্যায়

॥ তাল অংক ॥

তাল অংকে ৪২টি তালের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হল এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি তালের দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ, আড়, কুআড় এবং বিআড় লয়ে লিখবার পদ্ধতিও দেখান হল। সকল তালেরই লয়কারী দেওয়া হল না এই কারণে যে, এইগুলি লিখবার গাণিতিক পদ্ধতি সহজভাবে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এবং ওই নিয়মের সাহায্যে যে কোনও তালের যে কোনও লয়কারী লেখা যাবে।

সমান মাত্রা সংখ্যা সম্পন্ন একাধিক তালের একটি করে মাত্র তালকে বিভিন্ন লয়কারীতে লিখে দেখান হয়েছে; ওই একই মাত্রার অন্যান্য তালগুলির ক্ষেত্রে লয়কারীর আরম্ভের স্থান বা হিসাব একই প্রকার হবে, কেবলমাত্র প্রয়োজনানুসারে বিভাগ, তালি, খালি এবং বোল পরিবর্তন করতে হবে।

এই অধ্যায়ে যে তালগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে মাত্রা সংখ্যা সহ প্রথমেই তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

মাত্রা সংখ্যা তালের নাম

৬……… দাদরা।

৭……… রূপক, তীব্রা (তেওরা), পোস্তা বা পোস্ত্।

৮……… কাহারবা, অদ্ধা, ধুমালী, ঠুংরী, কাওয়ালী।

৯……… বসন্ত।

১০.......... ঝাঁপতাল, সুলতাল (সুরফাঁক তাল), ঝম্পা।

১১.......... রুদ্র, মণি, কুম্ভ।

১২.......... একতাল, চৌতাল, খেম্‌টা, বিক্রম।

১৪.......... ঝুমরা, আড়াচৌতাল, ধামার, ফরোদোস্ত, দীপচন্দী।

১৫.......... পঞ্চম সওয়ারী, গজঝম্প, যতিশেখর, চিত্রা।

১৬.......... ত্রিতাল, তিলয়াড়া, পাঞ্জাবী, যৎ, টপ্পা, সওয়ারী।

১৭.......... শিখর, বিষ্ণু।

১৮.......... মত্ত, লক্ষ্মী।

১৯.......... কৈদ ফরোদস্ত।

২১.......... গণেশ তাল।

২৮.......... ব্রহ্মতাল।

৬ মাত্রার তাল

॥ দাদরা ॥

মাত্রা সংখ্যা—৬। বিভাগ ২। প্রতি বিভাগে তিনটি মাত্রা। একটি তালি ও একটি খালি। ১ম মাত্রায় তালি এবং ৪র্থ মাত্রায় খালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩		৪	৫	৬
ধা	ধিন্	না	|	না	তিন্	না
×				০		

॥ দুইগুণ ॥

(৪ মাত্রা থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	১
ধা	ধিন্	না	ধা ধিন্	নানা	তিন্না	ধা
×			০			×

॥ তিনগুণ ॥

(৫ মাত্রাথেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	
ধা	ধিন	না	না	ধাধিননা	নাতিন্না	ধা
×			০			

॥ চারগুণ ॥

(৪½ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	১
ধা	ধিন্	না	না	ঽঽধাধিন্	নানাতিননা	ধা
×			০			×

॥ আড় লয় ॥

(৩ মাত্রা থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	১
ধা	ধিন	ধাঽধিন্	ঽনাঽ	নাঽতিন্	ঽনাঽ	ধা
×			০			×

৭ মাত্রার তাল

॥ রূপক ॥

মাত্রা সংখ্যা—৭। বিভাগ—৩। ১ম বিভাগে ৩ মাত্রা, ২য় ও ৩য় বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ২টি তালি এবং ১টি খালি। ১ম মাত্রায় খালি, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায় তালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তি	তি	না	ধি	না	ধি	না
০			১		২	

॥ দুইগুণ ॥

(৩½ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
তি	তি	না	ঽতি	তিনা	ধিনা	ধিনা	তি
০			১		২		০

॥ তিনগুণ ॥

(৪⅓ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
তি	তি	না	ধি	ঽঽতি	তিনাধি	নাধিনা	তি
০			১		২		০

॥ চারগুণ ॥

(৫¼ মাত্রার পর)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
তি	তি	না	ধি	না	ঽতিতিনা	ধিনাধিনা	তি
০			১		২		০

॥ আড়লয় ॥

(২ ১/৩ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
তি	তি	sতিs	|	তিsনা	sধিs	|	নাsধি	sনাs	|	তি
০				১			২			০

কুয়াড় লয়

(১ ২/৫ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		
তি	ssতিss	sতিsss	|	নাsssধি	sssনাs	|	ssধিss	sনাsss	|	তি
০				১			২			

॥ বিআড় লয় ॥

(৪ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
তি	তি	না	|	তিsssতিss	sনাsssধিs	|	ssনাsssধি	sssনাsss	|	তি
০				১			২			

॥ তীব্রা বা তেওরা ॥

তীব্রা তালের মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ ইত্যাদি রূপক তালের মত; অর্থাৎ এই তালের মাত্রাসংখ্যা—৭ এবং বিভাগ—৩টি। ১ম বিভাগে ৩টি মাত্রা এবং অপর দুটি বিভাগে ২+২=৪ মাত্রা। তবে রূপক তালে একটি খালি এবং দুটি তালি, কিন্তু তীব্রা তালে ৩টি তালি, খালি নেই। তালিগুলি পড়বে যথাক্রমে ১, ৪ এবং ৬ মাত্রায়।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধা	দেন্	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে
×			২		৩	

॥ পোস্তা বা পোস্ত্ ॥

মাত্রা সংখ্যা—৭। বিভাগ—৩টি। ১ম বিভাগে ৩টি মাত্রা এবং ২য় ও ৩য় বিভাগে ২টি করে ৪টি মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৪ ও ৬ মাত্রায়), খালি নেই। মতান্তরে মাত্রা সংখ্যা পাঁচ। গজল গানেই এই তাল বাজান হয়ে থাকে।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তৃক্	ধিন্	ऽ	ধা	ধা	তিন্	ऽ
			২		৩	

তীব্রা ও পস্তো তালের দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ, আড়, কুআড় এবং বিআড় লয় রূপক তালের হিসাবানুযায়ী লিখতে হবে, কেবলমাত্র ঠেকার বোল ও তালচিহ্নের পরিবর্তন করতে হবে।

৮ মাত্রার তাল

॥ কাহারবা ॥

মাত্রাসংখ্যা—৮। বিভাগ—দুটি। প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা। ১টি তালি ও ১টি খালি। ১ম মাত্রায় তালি, ৫ম মাত্রায় খালি।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	গে	না	তি	না	ক	ধি	না
×				০			

॥ দুইগুণ ॥

(৫ মাত্রা থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গে	না	তি	ধাগে	নাতি	নাক	ধিনা	ধা
×				০				×

॥ তিনগুণ ॥

(৫½ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৭	৭	৮	১
ধা	গে	না	তি	না	ঽধাগে	নাতিনা	কধিনা	ধা
×				০				×

॥ চারগুণ ॥

(৭ মাত্রা থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গে	না	তি	না	ক	ধাগেনাতি	নাকধিনা	ধা
×				০				×

॥ আড়লয় ॥

(২½ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	গে	ঽঽধা	ঽগেঽ	নাঽতি	ঽনাঽ	কঽধি	ঽনাঽ	ধা
×				০				×

॥ অদ্ধা ॥

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৫ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাধিন্	ঽধা	ধাধিন্	ঽধা	তাতিন	ঽনা	ধাধিন	ঽধা
		২		০		৩	

॥ ঝুমালী ॥

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়), ১টি খালি (৫ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধিন্	না	তিন্	না	ধিন্	ধাগে	ত্রেকেটে
		২		০		৩	

॥ ঠুংরী ॥

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—৪টি। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৭ মাত্রায়), ১টি খালি (৫ মাত্রায়)

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধিন্	ধা	গে	ধিন্	তিন্	ধা	গে	তিন্
×		২		০		৩	

॥ কওয়ালী ॥

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—২টি। প্রতি বিভাগে ৪টি করে মাত্রা। ২টি তালি (১ ও ৫ মাত্রায়), খালি নাই।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
ধা	কৎ	ধা	ধিন্	|	তা	কৎ	তা	ধিন্
×				|	২			

অদ্ধা, ধুমালী, ঠুংরী এবং কওয়ালী তালের দুইগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়লয় ইত্যাদি উপরি উক্ত কাহারবা তালের হিসাবানুযায়ী লিখতে হবে, কেবলমাত্র ঠেকার বোল, তালচিহ্ন এবং বিভাগ পরিবর্তিত হবে।

৯ মাত্রার তাল

॥ বসন্ত ॥

মাত্রা সংখ্যা—৯ এবং বিভাগও নয়টি। প্রতি বিভাগে ১টি করে মাত্রা। ৬টি তালি (১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ মাত্রায়) এবং ৩টি খালি (৫, ৭ ও ৯ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধা	দেৎ	দেৎ	থুন্	না	তেটে	কত	গদি	গন
×	২	৩	৪	০	৫	০	৬	০

॥ দুইগুণ ॥

(৪½ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা | দেৎ | দেৎ | থুন্ | ऽ ধা | দেৎ দেৎ | থুন না | তেটে কত |

× ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০ ৬

৯ ১

গদি গন | ধা

০ ×

॥ তিনগুণ ॥

(৭ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা | দেৎ | দেৎ | থুন | না | তেটে | ধাদেৎ দেৎ | থুন্‌না তেটে |

৯ ১

কত গদি গন | ধা

×

॥ চারগুণ ॥

(৬¾ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ধা | দেৎ | দেৎ | থুন্ | না | তেটে | ऽ ऽ ऽ ধা | দেৎ দেৎ থুন্ না |

× ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০ ৬

৯ ১

তেটে কত গদি গন | ধা

০ ×

॥ আড়লয় ॥

(৪ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধা | দেৎ | দেৎ | ধা ঽ দেৎ | ঽ দেৎ ঽ | থুন্ ঽ না | ঽ তেটে |
× ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০

৮ ৯ ১
কত গ | দি গ ন | ধা
৬ ০ ×

॥ কুআড়লয় ॥

(১$\frac{৪}{৫}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫
ধা | ঽ ঽ ঽ ঽ ধা | ঽ ঽ ঽ দেৎ ঽ | ঽ ঽ দেৎ ঽ ঽ | ঽ থুন্ ঽ ঽ ঽ |
× ২ ৩ ৪ ০

৬ ৭ ৮ ৯ ১
না ঽ ঽ ঽ তে | ঽ টে ঽ ক ঽ | ত ঽ গ ঽ দি | ঽ গ ঽ ন ঽ | ধা
৫ ০ ৬ ০ ×

॥ বিআড়লয় ॥

(৩$\frac{৬}{৭}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫
ধা | দেৎ | দেৎ | ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ধা | ঽ ঽ ঽ দেৎ ঽ ঽ ঽ |
× ২ ৩ ৪ ০

৬ ৭ ৮
দেৎ ঽ ঽ ঽ থুন্ ঽ ঽ | ঽ না ঽ ঽ ঽ তে ঽ | টে ঽ ক ঽ ত ঽ গ |
৫ ০ ৬

৯ ১
ঽ দি ঽ গ ঽ ন |
০ ×

১০ মাত্রার তাল

॥ ঝাঁপতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১০। বিভাগ ৪টি। ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা। অর্থাৎ ২।৪।২।৩ হিসাবে চারটি বিভাগ করা হয়েছে। ৩টি তালি (১, ৩ এবং ৮ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৬ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না
×		২			০		৩		

॥ দুইগুণ ॥

(৬ মাত্রা হতে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না	ধি	ধি	না	ধিনা	ধিধি	নাতি	নাধি	ধিনা	ধি
×		২			০		৩			×

॥ তিনগুণ ॥

(৬⅓ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	ssধি	নাধিধি	নাতিনা	ধিধিনা	ধি
×		২			০		৩			×

॥ চারগুণ ॥

(৭½ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	SSধিনা	ধিধিনাতি	নাধিধিনা	ধি
×		২			০		৩			×

॥ আড়লয় ॥

(৩⅓ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না	ধি	Sধিs	নাSধি	Sধিs	নাSতি	Sনাs	ধিSধি	Sনাs	ধি
×		২			০		৩			×

॥ কুআড় লয় ॥

(৩ মাত্রা হতে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না	ধিSSSনা	SSSধিS	SSধিSS	Sনাsss	তিSSSনা	SSSধিS	SSধিSS	SনাSSS	ধি
×		২			০		৩			×

॥ বিআড় লয় ॥

(৪⅔ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
ধি	না	ধি	ধি	SSধিSSনা	SSSধিSSS	ধিSSSনাS	Sতিsssনা	SSSধিSSSধি	SSSনাSSS	ধা
×		২			০		৩			

॥ সুলতাল বা সুরফাঁকতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১০। বিভাগ—৫ প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৩টি তালি (১, ৫, ৭ মাত্রায়) এবং ২টি খালি (৩ ও ৯ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা	দিন্	তা	কিট	ধা	তিট	কত	গদি	গন
		০		২		৩		০	

॥ ঝম্পা ॥

মাত্রা সংখ্যা—১০। বিভাগ—৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি করে ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঝাঁপতালের মত ২।৩।২।৩ ছন্দ। ৩টি তালি (১, ৩, ৮ মাত্রায় এবং ১টি খালি বা ফাঁক (৬ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধিন্	ऽ	ধা	গে	তি	ট	তি	ধা	কি	ট
×		২			০		৩		

ঝম্পা তালের দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়, কুআড় এবং বিআড় লয় অবিকল ঝাঁপতালের হিসাবানুযায়ী দেখাতে হবে, কেবলমাত্র ঠেকার বোলের পরিবর্তন হবে এবং সুলতালের লয়কারীতে বোল এবং বিভাগ উভয়ই পরিবর্তিত হবে।

১১ মাত্রার তাল

॥ রুদ্র তাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১১। বিভাগ—১১। প্রতি বিভাগে ১টি করে মাত্রা। ৮টি তালি (১, ২, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০ মাত্রায়) এবং ৩টি খালি (৩, ৭, ১১ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ধি	না	ধি	না	তা	তি	না	ক	ত্তা	ধি	না
×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০

॥ দুইগুণ ॥

(৫½ মাত্রা হতে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১
ধি	না	ধি	না	তা	ঽধি	নাধি	নাতা	তিনা	কত্তা	ধিনা	ধি
×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০	×

॥ তিনগুণ ॥

(৭⅓ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১
ধি	না	ধি	না	তা	তি	না	ঽধিনা	ধিনাতা	তিনাক	ত্তাধিনা	ধি
×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০	×

॥ চারগুণ ॥

(৮ ১/৪ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধি	না	ধি	না	তা	তি	না	ক
×	২	০	৩	৪	৫	০	৬

৯	১০	১১	১
sধিনাধি	নাতাতিনা	কত্তাধিনা	ধি
৭	৮	০	×

॥ আড়লয় ॥

(৩ ১/৩ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধি	না	ধি	ssধি	sনাs	ধিsনা	sতাs
×	২	০	৩	৪	৫	০

৮	৯	১০	১১	১
তিsনা	sকs	ত্তাsধি	sনাs	ধি
৬	৭	৮	০	×

॥ কুআড় লয় ॥

(২ ১/৫ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধি	না	sধিsss	নাsssধি	sssনাs	ssতাs	sতিsss
×	২	০	৩	৪	৫	০

৮	৯	১০	১১	১
নাsssক	sssত্তাs	ssধিss	sনাsss	ধি
৬	৭	৮	০	×

॥ বিআড় লয় ॥

(৪ৡ মাত্রার তাল)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধি	না	ধি	না	ssssssধি	ssনাssssধি	sssনাsss
×	২	০	৩	৪	৫	০

৮	৯	১০	১১	১
তাssssতিss	sনাssssক	ssত্তাধিsss	sssনাsss	ধি
৬	৭	৮	০	×

॥ কুম্ভতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১১। বিভাগ—১১। প্রতি বিভাগে ১টি করে মাত্রা। ৮টি তালি (১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯ ও ১০ মাত্রায়) এবং ৩টি ফাঁক বা খালি (২, ৬ ও ১১ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬			৯	১০	১১
ধি	না	তেটে	কত	ধি	না	তাক্	তেটে	কত	গদি	গন
×	০	২	৩	৪	০	৫	৬	৭	৮	০

॥ মণি তাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১১। বিভাগ—৪। ১ম, ৩য় ৪র্থ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা এবং ২য় বিভাগে ২টি মাত্রা (অর্থাৎ ৩ | ২ | ৩ | ৩ মাত্রা বিভাগ)। ৪টি তালি, খালি বা ফাঁক নেই।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ধা	ধি	ট	কি	ট	ধা	কি	ট	তা	কি	ট
×			২		৩			৪		

রুদ্র, কুম্ভ এবং মণি—এই তিনটি তালেরই মাত্রা সংখ্যা ১১। রুদ্র এবং কুম্ভ তালের বিভাগ একই প্রকার, কেবলমাত্র মণিতালের বিভাগ অন্যপ্রকার। কুম্ভ তালের যাবতীয় লয়কারী, বিভাগ ইত্যাদি রুদ্রতালের অনুরূপ হবে, কেবলমাত্র বোলগুলি পৃথক হবে; মণিতালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লয়ের হিসাব রুদ্রতালের মত হলেও বোল এবং বিভাগ পরিবর্তিত হবে।

॥ ১২ মাত্রার তাল ॥

॥ একতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১২। বিভাগ—৬। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৪টি তালি (১, ৫, ৯ ও ১১ মাত্রায়) এবং ২টি খালি বা ফাঁক (৩ ও ৭ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	থুন্	না	কৎ	তা
×		০		২		০	

৯	১০	১১	১২
ধাগে	তেরেকেটে	ধিন্	না
৩		৪	

॥ দুইগুণ ॥

(৭ মাত্রা থেকে)

১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮
ধিন্	ধিন্	|	ধাগে	তেরেকেটে	|	থুন্	না	|	ধিনধিন	ধাগেতেরেকেটে
×			০			২			০	

৯	১০		১১	১২		১
থুন্না	কৎতা	|	ধাগে তেরে কেটে	ধিন্না	|	ধিন্
৩			৪			×

॥ তিনগুণ ॥

(৯ মাত্রা থেকে)

১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮	
ধিন্	ধিন্	|	ধাগে	তেরেকেটে	|	থুন্	না	|	কৎ	তা	|
×			০			২			০		

৯	১০		১১	১২		
ধিন ধিন ধাগে	তেরেকেটেথুন্না	|	কৎতা ধাগে	তেরেকেটে ধিন্না	|	ধিন্
৩			৪			

॥ চারগুণ ॥

(১০ মাত্রা থেকে)

১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮	
ধিন্	ধিন্	|	ধাগে	তেরেকেটে	|	থুন্	না	|	কৎ	তা	|
×			০			২			০		

৯	১০		১১	১২
ধাগে ধিন	ধিন ধাগেতেরেকেটে	|	থুন্নাকৎতা	ধাগেতেরেকেটে ধিননা
৩			৪	

১
ধিন্
×

॥ আড়লয় ॥

(৫ মাত্রা থেকে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬
ধিন্ ধিন্	ধাগে তেরেকেটে	ধিন্ঽধিন্ঽ ধাগে
×	০	২

৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২	১
তেরেকেটে থুন্ঽনাঽ	কৎঽতা ঽধাগে	তেরেকেটে ধিন্ঽনাঽ	ধিন্
০	৩	৪	×

॥ কুআড় লয় ॥

(২$\frac{২}{৫}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬
ধিন্ ধিন্	ঽঽধিন্ঽঽ ঽধিন্ঽঽঽ	ধাঽগেঽতে রেকেটেথুন্ঽ
×	০	২

৭ ৮	৯ ১০
ঽঽনাঽঽ ঽকৎঽঽঽ	তাঽঽঽধা ঽগেঽতেরে
০	৩

১১ ১২	১
কেটেধিন্ঽঽঽ ঽনাঽঽঽ	ধিন
৪	×

॥ বিআড় লয় ॥

(৫$\frac{২}{৭}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬
ধিন্ ধিন্	ধাগে তেরেকেটে	থুন ঽধিন্ঽঽঽধিন্
×	০	২

৭	৮	৯	১০
ssধাsগেsতে	রেকেটেথুন্ss	নাsssক্sss	sতাsssধাs
		৩	

১১	১২	১
গেsতেরেকেটেধিন্	sssনাsss	ধিন্
৪		×

॥ চৌতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১২। বিভাগ—৬। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৪টি তালি (১, ৫, ৯, ও ১১ মাত্রায়) এবং ২টি খালি বা ফাঁক (৩ ও ৭ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দিন্	তা	কিট	ধা	দিন্	তা	তিট	কত	গদি	গন
×		০		৩		০		৩		৪	

॥ খেমটা ॥

মাত্রা সংখ্যা—১২। বিভাগ—৪। প্রতি বিভাগে ৩টি করে মাত্রা (৩ | ৩ | ৩ | ৩)। ৩টি তালি (১, ৪ ও ১০ মাত্রায়.) এবং ১টি খালি বা ফাঁক (৭ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	তে	টে	ধা	ধি	না	তা	তে	টে	না	তি	না
×			২			০			৩		

॥ বিক্রম ॥

মাত্রা সংখ্যা—১২। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ২টি, ২য় ও ৩য় বিভাগে ৩টি করে এবং ৪র্থ বিভাগে ৪টি মাত্রা (২ | ৩ | ৩ | ৪)। ৩টি তালি (১, ৩ ও ৯ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৬ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২		৩	৪	৫		৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
ধা	ऽ	|	ধি	তা	ऽ	|	ক	ऽ	তা	|	তিট	কত	গদি	গন
×		|	২			|	০			|	৩			

চৌতাল, খেমটা এবং বিক্রম তালের লয়কারী একতালের অনুরূপ হবে। খেমটা এবং বিক্রম তালের বিভাগ পরিবর্তিত হবে।

১৪ মাত্রার তাল

॥ ঝুমুরা ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৪। বিভাগ—৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ৩টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৩ | ৪ | ৩ | ৪)। ৩টি তালি (১, ৪ ও ১১ মাত্রায়); ১টি ফাঁক (৮ মাত্রায়)

॥ ঠেকা (১ম প্রকার) ॥

১	২	৩		৪	৫	৬	৭	
ধিন্	ऽধা	তেরেকেটে	|	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	|
×			|	২				|

৮	৯	১০		১১	১২	১৩	১৪
তিন্	ऽতা	তেরেকেটে	|	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে

ঠেকা (২য় প্রকার) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধিন্	ধিন্	ধা	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	তিন্	তিন্	তা
×			২				০		

১১	১২	১৩	১৪
ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে
৩			

॥ দুইগুণ ॥

(৮ মাত্রা হতে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধিন্	ধিন্	ধা	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	ধিন্ধিন্	ধাধিন	ধিন্ধাগে
×			২				০		

১১	১২	১৩	১৪	১
তেরেকেটে-তিন্	তিন্তা	ধিন্ধিন্	ধাগে তেরেকেটে	ধিন্
৩				×

॥ তিনগুণ ॥

(৯⅓ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধিন্	ধিন্	ধা	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	তিন্	তিন্	ঽ ধিন্ধিন্
			২				০		

১১	১২	১৩	১৪	১
ধা ধিন্ ধিন্ ধাগে	তেরেকেটে তিন তিনতা	ধিন্ ধিন্ ধাগে	তেরেকেটে	ধিন্
৩				

॥ চারগুণ ॥

(১০½ মাত্রার পর হতে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭ | ৮ ৯ ১০ | ১১
ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে | তিন্ তিন্ তা | ssধিন্ ধিন্

১২ ১৩ ১৪
ধাধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে তিন তিন তা ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে |

১
ধিন্
×

॥ আড়লয় ॥

(৪⅔ মাত্রার পর হতে)

৩ | ৪ ৫ ৬ ৭ | ৮ ৯
ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন্ ssধিন্ sধিন্s ধাsধিন্ | sধিনধাগে sতেরেকেটে
২ | ০

১০ | ১১ ১২ ১৩ ১৪ | ১
sতিনs | তিন্sতা sধিনs ধিনsধাগে sতেরেকেটে | ধিন্
৩ | ×

॥ কুআড় লয় ॥

(২⅘ মাত্রা পর হতে)

৩ | ৪ ৫ ৬ ৭ |
ধিন্ ধিন্ sssধিন্ | ssধিন্ss sধাsss ধিন্sধিন্ sssধাs |
২

৮ ৯ ১০ | ১১ ১২
গেsতেরেকেটে ssতিনs ssতিন্ss | তাsssধিন্ sssধিন্s
৩

১৩ ১৪ | ১
ssধাsগে sতেরেকেটে | ধিন্
×

॥ বিআড় লয় ॥

(৭ মাত্রা হতে)

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬ ৭	৮ ৯
ধিন্ ধিন্ ধা	ধিন্ ধিন্ ধাগে ধিন্sssধিনss	sধাsssধিন্s ssধিন্ssধা
×	২	০

১০	১১ ১২ ১৩
sগেsতেরেকেটে	তিন্sssতিন্ss sতাsssধিন্s ssধিনsssধা
	৩

১৪	১
sগেsতেরেকেটে	ধিন্

॥ আড়া চৌতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৪। বিভাগ—৭। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৪টি তালি (১, ৩, ৭ ও ১১ মাত্রায়) এবং ৩টি ফাঁক (৫, ৯ ও ১৩ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০
ধিন্ ধিন্	ধাগে তেরেকেটে	থুন্ না	কৎ তা	ধিন্ ধিন্
×	২	০	৩	০

১১ ১২	১৩ ১৪
না ধিন্	ধিন্ না
৪	০

॥ ধামার ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৪। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ৫মাত্রা, ২য় বিভাগে ২ মাত্রা, ৩য় বিভাগে ৩ মাত্রা এবং ৪র্থ বিভাগে ৪মাত্রা (৫।২।৩।৪)। ৩টি তালি (১, ৬ ও ১১ মাত্রায়) এবং ১টি ফাঁক (৮ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ক	ধি	ট	ধি	ট	ধা	ঽ	গ	দি	ন	দি	ন	তা	ঽ
×					২		০			৩			

॥ দীপচন্দী ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৪। বিভাগ—৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ৩টি করে এবং ২য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৩।৪।৩।৪)। ৩টি তালি (১, ৪ ও ১১ মাত্রায়) এবং ১টি ফাঁক (৮ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধা	ধিন্	ঽ	ধা	গে	তিন্	ঽ	তা	তিন্	ঽ	ধা	গে	ধিন্	ঽ
×			২				০			৩			

॥ ফরোদস্ত ॥

মাত্রা—১৪। বিভাগ—৭। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা (২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২)। ৫টি তালি (১, ৫, ৭, ৯ ও ১১ মাত্রায়) এবং ২টি ফাঁক (৩ ও ১৩ মাত্রায়)।

মতান্তরে বিভাগ ৫টি। ১ম ও ২য় বিভাগে ৪টি করে মাত্রা এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ৫টি তালি (১, ৫, ৯, ১১ এবং ১৩ মাত্রায়)। ফাঁক নেই।

॥ ঠেকা ॥

২	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে	থুন্	না	কৎ	তা	ধিনা	কৃধি
×		০		২		৩		৪	

১১	১২	১৩	১৪
নাক্	ধিনা	কৃধি	নাক্
৫		০	

ঝুমরা তালের হিসাব মতই আড়াচৌতাল, ধামার, দীপচন্দী এবং ফরোদস্ত তালের লয়কারী লিখতে হবে।

১৫ মাত্রার তাল

॥ পঞ্চম সওয়ারী বা ছোট সওয়ারী ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৫। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ৩টি মাত্রা এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৩ | ৪ | ৪ | ৪)। ৩টি তালি (১, ৪ ও ১২ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৮ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধিন্	তেরেকেটে	ধিনা	কৎ	ধিধি	নাধি	ধিনা	তিন্	তিনা
×			২				০	

১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
তেরেকেটে	তুনা	কৎতা	ধিধি	নাধি	ধিনা

॥ দুইগুণ ॥

(৭½ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭

ধিন্ তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা |

২

৮ ৯ ১০ ১১ | ১২ ১৩

sধিন্ তেরেকেটেধিনা কৎধিধি নাধিধিনা | তিন্‌তিনা তেরেকেটেতুনা

৩

১৪ ১৫

কৎতাধিধি নাধিধিনা ধিন্

॥ তিনগুণ ॥

(১১ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭ | ৮ ৯

ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা

× ২ ০

১০ ১১ | ১২ ১৩

তেরেকেটে ধিনতেরেকেটেধিনা | কৎধিধিনাধি ধিনাতিনতিনা

৩

১৪ ১৫ | ১

তেরেকেটেতুনাকৎতা ধিধিনাধিধিনা | ধিন্

। চারগুণ ॥

(১১½ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭ | ৮ ৯
ধিন্ তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা
× | ২ | ০

১০ ১১ | ১২ ১৩
তেরেকেটে তুনা | ১ ধিনতেরেকেটেধিনা কৎধিধিনাধিধিনা
| ৩

১৪ ১৫
তিন্ তিনা তেরেকেটেতুনা কৎতা ধিধিনা ধিধিনা ধিন্

॥ আড়লয় ॥

(৬ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন্ তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি ধিনাঽতেরেকেটে ঽধিনাঽ
| ২

৮ ৯ ১০ ১১ | ১২
কৎঽধিধি ঽনাধিঽ ধিনাঽতিন্ ঽতিনাঽ | তেরেকেটেঽতুনা
| ৩

১৩ ১৪ ১৫ | ১
ঽকৎতাঽ ধিধিঽনাধি ঽধিনাঽ | ধিন্

॥ কুয়াড় লয় ॥

(৪ মাত্রাথেকে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন্ তেরেকেটে ধিনা | ধিন্sss তেরেকেটেs ধিsনাsকৎ ssধিধিs
× | ২

৮ ৯ ১০ ১১ | ১২
নাsধিsধি sনাsতিন্s ssতিsনা sতেরেকেটে | তুsনাsকৎ
০ | ৩

১৩ ১৪ ১৫
s'তাsধিs ধিsনাsধি sধিsনাs ধিন

॥ বিআড় লয় ॥

(৬½ মাত্রার পর থেকে)

২ ৩ | ৪ ৫ ৬ ৭
ধিন্ তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি sssধিন্sss
| ২

৮ ৯ ১০ ১১
তেরেকেটেধিsনা sকৎsssধিs ধিsনাsধিsধি sনাsতিন্sss
০

১২ ১৩ ১৪ ১৫
তিsনাsতেরেকে টেতুsনাsকৎs তাsধিsধিsনা sধিsধিsনাs ধিন্

॥ গজঝম্প ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৫। বিভাগ—৫। ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগে ৪টি করে মাত্রা এবং ৪র্থ বিভাগে ৩টি মাত্রা (৪ | ৪ | ৪ | ৩)। ৩টি তালি (১, ৫ ও ১৩ মাত্রায় এবং ১টি খালি (৯ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধিন্	নক্	তক	ধা	ধিন্	নক	তক
×				২			

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ধিন্	নক	তক	কিট	তক	গদি	গন
০				৩		

॥ যতিশেখর ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৫। বিভাগ—১০। ১ম, ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম বিভাগে ১টি করে মাত্রা এবং ২য়, ৩য় ৬ষ্ট, ৯ম বিভাগে ২টি করে মাত্রা (১ | ২ ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২) ১০টি তালি, খালি নাই।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ধা	কৎ	ধিন্	না	তেটে	ধি	ধি	না	তেটে	ধাগি	নাধা
×	২		৩		৪	৫	৬		৭	৮

১২	১৩	১৪	১৫
তেরেকেটে	ধিনা	গদি	গন
৯		১০	

॥ চিত্রা ॥

মাত্রাসংখ্যা—১৫। বিভাগ—৫। ১ম ও ৫ম বিভাগে ২টি করে মাত্রা, ২য় বিভাগে ৩টি ও ৪র্থ বিভাগে ৪টি মাত্রা (২ | ৩ | ৪ | ৪ | ২)। ৪টি তালি (১, ৩, ৬ এবং ১০ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (১৪ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ধি	না	ধি	ধি	না	থুন্	না	কৎ	তা	তেরেকেটে	ধি	না	ধি	ধি	না
×		২							৪				০	

গজঝম্প, যতিশেখর এবং চিত্রা তালের লয়কারী পঞ্চম বা ছোট সওয়ারীর হিসাবানুযায়ী করতে হবে, কেবলমাত্র বোল, বিভাগ ইত্যাদি পরিবর্তন করতে হবে।

১৬ মাত্রার তাল

॥ ত্রিতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৬। বিভাগ—৪। প্রতি বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৪ | ৪ | ৪ | ৪)। ৩টি তালি (১, ৫ ও ১৩ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৯ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন	ধা	না	তিন্	তিন্	না	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা
				২				০							

॥ দুইগুণ ॥

(৯ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২
ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধাধিন্‌ ধিন্‌ধা ধাধিন্‌ ধিন্‌ধা
× | ২ | ০

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ | ১
নাতিন্‌ তিন্‌না তেটেধিন ধিন্‌না | ধা
৩ | ×

॥ তিনগুণ ॥

(১০½ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা
× | ২

১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
না তিন্‌ ssধা ধিন্‌ধিন্‌ধা | ধাধিন্‌ধিন্‌ ধানাতিন্‌ তিন্‌নাতেটে ধিন্‌ধিন্‌ধা
| ৩

| ১
| ধা
| ×

॥ চারগুণ ॥

(১৩ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা
× | ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫
না তিন্‌ তিন্‌ না | ধাধিন্‌ধিন্‌ধা ধাধিন্‌ধিন্‌ধা নাতিন্‌তিন্‌না
| ৩

১৬ | ১
তেটেধিন ধিন্‌ধা | ধা
| ×

॥ আড়লয় ॥

(৫ ১/৩ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা sধাs ধিন্s ধিন্s sধাs
× | ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধাsধিন্ sধিন্s ধাsনা sতিন্s | তিন্sনা sতেটেs ধিন্sধিন্ sধাs | ধা
| ৩

॥ কুআড় লয় ॥

(৩ ১/৫ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন্ ধিন্ sধাsss | ধিন্sssধিন্ sssধাs ssধা৪s sধিন্sss
| ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫
ধিন্sssধা sssনাs ssতিন্ss sতিন্ss | নাsssতেটে sssধিন্s ssধিন্ss
| ৩

১৬
sধাsss | ধা

॥ বিআড় লয় ॥

(৬ ৬/৭ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮
ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ssssssধা sssধিন্sss
| ২

৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩
ধিন্sssধাss sধাsssধিন্s ssধিন্sssধা sssনাssss | তিন্sssতিন্ss
| ০

১৪ ১৫ ১৬ | ১
sনাsssতেটে ssধিন্sssধিন্ sssধাsss | ধা

॥ তিলয়াড়া ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৬—। বিভাগ—৪। প্রতি বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৪ | ৪ | ৪ | ৪)। ৩টি তালি (১, ৫ ও ১৩ মাত্রায়) এবং একটি খালি (৯ মাত্রায়)। তিলয়াড়া তালের মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি ইত্যাদি সবই পূর্বোক্ত ত্রিতাল তালের মত। কেবলমাত্র এই তালের বোল ত্রিতাল হতে পৃথক এবং বিলম্বিত খেয়ালের সঙ্গেই তিলয়াড়া বাজান হয়। মধ্যলয় কিংবা দ্রুত খেয়ালের সঙ্গে বাজান হয় ত্রিতাল।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	তেরেকেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তিন্	তিন
×				২			

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
তা	তেরেকেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন
০							

॥ পাঞ্জাবী ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৬। বিভাগ—৪। প্রতি বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (৪ | ৪ | ৪ | ৪)। ৩টি তালি (১, ৫ ও ১৩ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৯ মাত্রায়)। এই তালটির মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি ইত্যাদি ত্রিতাল এবং তিলয়াড়ার মত। তবে এর বোল পৃথক এবং গতি আড়লয়ে।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ঽধি	ঽক	ধা	ধা	ঽধি	ঽক	ধা
×				২			
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
তা	ঽতি	ঽক	তা	ধা	ঽধি	ঽক	ধা
০				৩			

॥ যৎ ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৬। বিভাগ—৪। প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা (৪ | ৪ | ৪ | ৪)। ৩টি তালি (১, ৫ ও ১৩ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৯ মাত্রায়)। ত্রিতাল, তিলয়াড়া, এবং পাঞ্জাবী তালের সঙ্গে যৎ-এর বোল ব্যতীত মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ ইত্যাদিতে কোনও প্রভেদ নাই। এই তালটি আড়িতে বাজে এবং টপ্পা ঠুংরী ইত্যাদি গানের সঙ্গে এর ঠেকা দেওয়া হয়।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ঽ	ধিন্	ঽ	ধা	ধা	তিন্	ঽ
×				২			
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
তা	ঽ	তিন্	ঽ	ধা	ধা	ধিন্	ঽ
০				৩			

॥ টপ্পা ॥

মাত্রা—১৬। বিভাগ—৪। প্রতি বিভাগে ৪টি মাত্রা (৪ | ৪ | ৪ | ৪) ৩টি তালি (১, ৫ ও ১৩ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৯ মাত্রায়) ত্রিতাল, তিলোয়াড়া, পাঞ্জাবী ও যৎ-এর সঙ্গে বোল ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে টপ্পার মিল আছে। এই তালের বোলও আড়িতে বাজান হয় এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে টপ্পা জাতীয় গানে এই তাল প্রযুক্ত হয়। বর্তমানে টপ্পা তাল খুব বেশী শোনা যায় না।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
ধিন্	তা	ধিন্	ধিন্	|	ধিন্	তা	ধিন্	ऽ
×					২			

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	গে	দিন্	ऽ	|	ধিন্	তা	ধিন্	ধিন
					৩			

॥ সওয়ারী ॥

সওয়ারী তাল অষ্টাদশ প্রকারের আছে। এর মধ্যে কয়েকটির নাম তৃতীয় সওয়ারী, চতুর্থ সওয়ারী, পঞ্চম সওয়ারী, ষষ্ঠ সওয়ারী, সপ্তম সওয়ারী, শুদ্ধ সওয়ারী, কয়েদ সওয়ারী, বসারী সওয়ারী, অথমঞ্জরী সওয়ারী ইত্যাদি। এই সকল সওয়ারী তালের মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ তালি, খালি ইত্যাদি একপ্রকার নয়। একমাত্র পঞ্চম সওয়ারী ব্যতীত অন্যান্য সওয়ারী তাল অপ্রচলিত।— পাঠ্যক্রমে ১৬ মাত্রার সওয়ারী তাল অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য আমরা এখানে ১৬ মাত্রার দুই প্রকার সওয়ারী তালের আলোচনা করব—বসারী সওয়ারী এবং অথমঞ্জরী সওয়ারী।—

॥ বসারী সওয়ারী ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৬। বিভাগ—৮। প্রতি বিভাগে ২টি মাত্রা (২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২)। ৪টি তালি (১, ৫, ৯ ও ১৩ মাত্রায়) এবং ৪টি খালি (৫, ৩, ৭, ১১ ও ১৫ মাত্রায়)।

ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধিন্	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধিন্ধিন	ধাধিন্	ধিন্ধা
×		০		২		০	

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
তিনতেরেকেটে	তিনা	তিনা	তিনা	কৎতা	ধিন্ধিন্	ধাধিন্	ধিন্না
৩		০		৪			

॥ অথমঞ্জরী সওয়ারী ॥

মাত্রাসংখ্যা এবং বিভাগ বসারী সওয়ারীর মত। তবে এই তালে তালি ৫টি (১, ৩, ৭, ৯ ও ১৩ মাত্রায়) এবং খালি ৩টি (৫, ১১ ও ১৫ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	তেরেকেটে	ধিন্	ধা	তা	তেরেকেটে	ধিন্	ধা
×		২		০		৩	

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধাগে	তেরেকেটে	তিন্	না	ধাগে	তেরেকেটে	ধুন্	নানা
৪		০		৫			

১৭ মাত্রার তাল

॥ শিখর ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৭। বিভাগ—৪। ১ম ও ২য় বিভাগে ৬টি করে মাত্রা, ২য় বিভাগে ৩টি মাত্রা (৬ | ৬ | ২ | ৩)। ৩টি তালি (১, ১৩ ও ১৫ মাত্রায়) এবং একটি খালি (৭ মাত্রায়)। তবে তালি ও খালির বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	|	৭	৮	৯	১০	১১	১২	|
ধা	ত্রক	ধিন্	নক	থুন্	গা	|	ধিন্	নক্	ধুম	কিট	তক	ধেৎ	|
						|	২						|

১৩	১৪	|	১৫	১৬	১৭
ধা	তিট	|	কত	গদি	গন
০		|	৩		

॥ দুইগুণ ॥

(৮½ মাত্রা থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	|	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ত্রক	ধিন্	নক	থুন্	গা	|	ধিন্	নক্ ঽধা	ত্রকধিন্	নকথুন্	গাধিন	
×						|	২					

১৩	১৪	|	১৫	১৬	১৭	১
নকধুম	কিটতক	|	ধেৎধা	তিটকত	গদিগন	ধা
০		|	৩			×

॥ তিনগুণ ॥

(১১ঙ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ত্রক	ধিন	নক	থুন্	গা	ধিন্	নক্	ধুম	কিট	তক	ঽধাত্রক
×						২					

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১
ধিন্নকথুন্	গাধিন্নক	ধুমকিটতক	ধেৎধাতিট	কতগদিগন	ধা
০		৩			×

॥ চারগুণ ॥

(১২ঙ্ক মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ত্রক	ধিন	নক	থুন্	গা	ধিন্	নক	ধুম	কিট	তক	ধেৎ
×						২					

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১
ঽঽঽধা	ত্রকধিন্নকথুন্	গাধিন্নকধুম	কিটতকধেৎধা	তিটকতগদিগন	ধা
		৩			

॥ আড়লয় ॥

(৫ঙ্ক মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ত্রক	ধিন্	নক	থুন	ঽঽধা	ঽত্রক	ধিন্ঽন	কথুন্ঽ	গাঽধিন	ঽনক	ধুমকি
×						২					

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১
টতক	ধেৎঽধা	ঽতিট	কতগ	দিগন	ধা

॥ কুআড় লয় ॥

(৩২/৪ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯
ধা ত্রক ধিন্ ssধাss sত্রsকs ধিন্sssন | sকsধুন্s ssগাss sধিন্ss
× | ২

১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ | ১৫ ১৬
নsকsধু sমকিs টsতsকs | sধেৎss ধাsssতি | sটsকs তsগsদি
| ০ | ৩

১৭ | ১
sগsনs | ধা
| ×

॥ বিআড় লয় ॥

(৭৩/৪ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ ১০
ধা ত্রক ধিন্ নক ধুন্ গা | ধিন্ ssধাssssত্র sকsধিন্sss নsকsধুন্ss
× | ২

১১ ১২ | ১৩ ১৪ | ১৫
sগাsssধিন্s ssনsকৎধু | sমsকিsটs তsকs ধেৎss | sধাsssতিs
| ০ | ৩

১৬ ১৭ | ১
টsকsতsগ sদিsগsনs | ধা
| ×

॥ বিষ্ণু তাল ॥

মাত্রা সংখ্য—১৭। ১ম বিভাগে ২টি, ২য় বিভাগে ৩টি, ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (২ | ৩ | ৪ | ৪ | ৪)। ৪টি তালি (১, ৩, ৬ ও ১০ মাত্রায়) এবং ১টি খালি ১৪ মাত্রায়।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধিন্‌	না	ধিন্‌	ধিন্‌	না	ধিন্‌	ত্রক	ধি	না
×		২			৩			

১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ধিন্‌	ধিন্‌	না	ধিন্‌	ধি	না	ধি	না
৪				০			

বিষ্ণু তালের যাবতীয় লয়কারীর কাজ শিখর তালের মতই হবে তবে বোল, বিভাগ ইত্যাদি পরিবর্তিত হবে।

১৮ মাত্রার তাল

॥ মত্তভাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৮। বিভাগ—৯। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা (২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২)। ৩টি তালি (১, ৫, ৭, ১১ ১৩ ও ১৫ মাত্রায়) এবং ৩টি খালি (৩, ৯ ও ১৭ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ধা	ঽ	ঘি	ড়	ন	ক	ঘি	ড়	ন	ক	তি	ট	ক	ত	গ	দি	গ	ন
×		০		২		৩		০		৪		৫		৬		০	

॥ দুইগুণ ॥

(১০ মাত্রা হতে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২	১৩ ১৪
ধা S	ঘি ড়	ন ক	ঘি ড়	ন ধাS	ঘিড় নক	ঘিড় নক
×	০	২	৩	০	৪	৫

১৫ ১৬	১৭ ১৮	১
তিট কত	গদি গন	ধা
৬	০	×

॥ তিনগুণ ॥

(১৩ মাত্রা হতে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২	১৩ ১৪
ধা S	ঘি ড়	ন ক	ন ক	তি ট	তি ট	ধাSঘি ড়নক
×	০	২	৩	০	৪	৫

১৫ ১৬	১৭ ১৮	১
ঘিড়ন কতিট	কতগ দিগন	ধা
৬	০	×

॥ চারগুণ ॥

(১৩½ মাত্রার পর হতে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২	১৩ ১৪
ধা S	ঘি ড়	ন ক	ঘি ড়	ন ক	তি ট	ক SSধাS
×	০	২	৩	০	৪	৫

১৫ ১৬	১৭ ১৮	১
ঘিড়নক ঘিড়নক	তিটকত গদিগন	ধা
৬	০	×

॥ আড়লয় ॥

(৭ মাত্রা থেকে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২
ধা s	ঘি ড়	ন ক	ধাss sঘি	ড়sন sনs	ঘিsড় sনs
×	০	২	৩	০	৪

১৩ ১৪	১৫ ১৬	১৭ ১৮	১
কsতি sটs	কsত sগs	ঘিsগ sনs	ধা
৫	৬	০	×

॥ কুআড় লয় ॥

(৩ ৩/৫ মাত্রা পর হতে)

১ ২ ৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮
ধা s ঘি sssধাs	sssss sঘিsss	ড়sssন sssকs
× ০	২	৩

৯ ১০	১১ ১২	১৩ ১৪	১৫ ১৬
ssঘিss sড়sss	নsssক sssতি	ssটss sকsss	তsssগ sssদিs
০	৪	৫	৬

১৭ ১৮	১
ssগss sনsss	ধা
০	×

॥ বিআড় লয় ॥

(৭½ মাত্রার পর থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	S	ঘিঁ	ড়	ন	ক	ঘি	SSSSSধাS	SSSSSSঘি	SSSড়SSS
×		০		২		৩		০	

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
নSSSকSS	SঘিSSSড়S	SSনSSক	SSSতেSSS	টেSSSকSS	SতSSSগS
৪		৫		৬	

১৭	১৮	১
SSদিSSSগ	SSSনSSS	ধা
০		×

॥ লক্ষ্মীতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৮। বিভাগ—১৫। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১৫শ বিভাগে দুটি করে মাত্রা এবং অন্যান্য সকল বিভাগে ১টি করে মাত্রা (১ | ১ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২)। ১৫টি তালি, খালি নাই।

মতান্তরে মাত্রা সংখ্যা—৩৬। ১৮ মাত্রার লক্ষ্মীতালে অনেকে প্রতি বিভাগে ১টি করে মাত্রা নিয়ে ১৮টি বিভাগও করে থাকেন এবং ১৫টি তালি এবং ৩টি খালির উল্লেখ করেছেন।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধিন্	ঘিড়	নক	ধেৎ	ধেৎ	ঘিড়	নক	দিন্	তা
১	২	৩		৪	৫	৬		৭

১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তিট	কত	ধা	দিন্	তা	কিট	তক	গদি	গন
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	

লক্ষ্মী তালের যাবতীয় লয়কারীর কাজ পূর্ববর্তী মত্ত তালের অনুরূপ হবে, কেবলমাত্র বোল, বিভাগ এবং তালচিহ্ন পরিবর্তিত হবে।

১৯ মাত্রার তাল

॥ কৈদ ফরোদস্ত ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৯। বিভাগ—৭। ১ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ বিভাগে ৩টি করে মাত্রা, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বিভাগে ২টি করে এবং ৭ম বিভাগে ৪টি মাত্রা (৩ | ৩ | ২ | ২ | ২ | ৩ | ৪)। ৫টি তালি (১ম, ৭ম, ৯ম, ১১শ, ১৩শ ও ১৬শ মাত্রায়) এবং ১টি খালি (৬ষ্ঠ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ | ১১ ১২
ধা ধিন্ ধাগে | থুন্ না কেটে | ধেৎ তা | কৎ তা | ধাগে তেরেকেটে
× | ০ | ২ | ৩ | ৪

১৩ ১৪ ১৫ | ১৬ ১৭ ১৮ ১৯
তাগে নেতা গেনে | তেটে কতা গদি গন
৫ | ৬

॥ দুইগুণ ॥

(৯½ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০
ধা ধিন্ ধাগে | থুন্ না কেটে | ধেৎ তা | কৎ ঽধা
× | ০ | ২ | ৩

১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ | ১৬
ধিন্ধাগে থুন্না | কেটেধেৎ তাকৎ তাধাগে | তেরেকেটে তাগে
৪ | ৫ | ৬

১৭ ১৮ ১৯ | ১
নেতাগেনে তেটেকতা গদিগন | ধা
| ×

॥ তিনগুণ ॥

(১২ই মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০
ধা ধিন্ ধাগে | ধুন্ না কেটে | ধেৎ তা | কৎ তা
× | ০ | ২ | ৩

১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ | ১৬
ধাগে তেরেকেটে | SSধা ধিন্ধাগেধুন্ ন্যাকেটেধেৎ | তাকৎতা
৪ | ৫ | ৬

১৭ ১৮ ১৯ | ১
ধাগেতেরেকেটেতাগে নেতাগেনেতেটে কতাগদিগন | ধা
| ×

॥ চারগুণ ॥

(১৪ই মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ | ১১ ১২
ধা ধিন্ ধাগে | ধুন্ না কেটে | ধেৎ তা | কৎ তা | ধাগে তেরেকেটে
| ০ | ২ | ৩ | ৪

১৩ ১৪ ১৫ | ১৬ ১৭
তাগে নেতা Sধাধিন্ধাগে | ধুন্নাকেটেধেৎ তাকৎতাধাগে
| ৬

১৮ ১৯ | ১
তেরেকেটেতাগেনেতাগেনে তেটেকতাগদিগন | ধা
| ×

॥ আড়লয় ॥

(৬ $\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	৭ ৮	৯
ধা ধিন্ ধাগে	থুন্ না কেটে	sধাs ধিন্sধাগে	sথুনs
	০	২	৩

১০	১১ ১২	১৩ ১৪ ১৫
নাsকেটে	sধেৎs তাsকৎ	sতাs ধাগেsতেরে কেটেতাগেs
	৪	৫

১৬ ১৭ ১৮ ১৯	১
নেতাsগেনে sতেটেs কতাsগদি sগনs	ধা
৬	×

॥ কুআড়লয় ॥

(৩ $\frac{৪}{৫}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	৭ ৮
ধা ধিন ধাগে	ssssধা sssধিন্s ssধাsগে	sথুন্sss নাsssকে
	০	২

৯ ১০	১১ ১২	১৩
sটেsধেৎs ssতাss	sকৎsss তাsssধা	sগেsতেরে
	৪	৫

১৪ ১৫	১৬ ১৭ ১৮
কেটেতাsগে sনেতাsss	গেsনেsতে sটেsকs তাsগদিss
	৬

১৯	১
sগনsss	ধা
	×

॥ বিআড় লয় ॥

(৮ই মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	৭ ৮	৯
ধা ধিন ধাগে	ধুন্ না কেটে	ধেৎ তা	sধাsssধিন্s
×	০	২	৩

১০	১১ ১২	১৩
ssধাsগেsধুন্	sssনাsss কেsটেsধেৎss	sতাsssকৎs
	৪	৫

১৪ ১৫	১৬ ১৭
ssতাsssধা sগেsতেরেকেটে	sগেsনেsতেটে sগেsনেsতেটে
	৬

১৮ ১৯	১
ssকতাsssগদি sssগনsss	ধা
	×

২১ মাত্রার তাল

॥ গণেশ তাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—২১। বিভাগ—১০। ১ম, ৩য় ও ৬ষ্ঠ বিভাগে ৪টি করে, ২য়, ৪র্থ, ৫মঃ ৭ম, ৮ম ও ৯ম বিভাগে ৩টি মাত্রা (৪ | ১ | ৪ | ১ | ১ | ৪ | ১ | ১ | ১ | ৩)। ১০টি তালি (১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ১০ম ১১শ, ১২, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ এবং ১৯শ মাত্রায়), খালি নাই।— মতান্তরে এই তালের মাত্রা সংখ্যা ১৮; বিভাগ—৫ (৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪)। ৫টি তাল।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ ৩ ৪ | ৫ | ৬ ৭ ৮ ৯ | ১০ | ১১
ধা ধা দেন্ তা | কৎ | তাগে ধা দেন্ তা | কৎ | তিট
× | ২ | ৩ | ৪ | ৫

১২ ১৩ ১৪ ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ ২০ ২১
তা ধাগে দেন্ তা | থুন্ | না | তিট | কত গদি গন
৬ | | ৮ | ৯ | ১০

॥ দুইগুণ ॥

(১০½ মাত্রার পর হতে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ | ৬ ৭ ৮ ৯ | ১০ | ১১ | ১২ ১৩
ধা ধা দেন্ তা | কৎ | তাগে ধা দেন্ তা | কৎ | -ধা | ধাদেন তাকৎ
× | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬

১৪ ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ ২০ ২১
তাগেধা দেন্তা | কৎতিট | তাধাগে | দেন্তা | থুন্না তিটকত গদিগ
| ৭ | ৮ | ৯ | ১০

| ১
| ধা
| ×

॥ তিনগুণ ॥

(১৫ মাত্রা থেকে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ | ৬ ৭ ৮ ৯ | ১০ | ১১ | ১২ ১৩
ধা ধা দেন্ তা | কৎ | তাগে ধা দেন্ তা | কৎ | তিট | তা ধাগে
× | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬

১৪ ১৫ | ১৬ ১৭ | ১৮
দেন্ ধাধাদেন্ | তাকৎতাগে ধাদেন্তা | কৎতিটতা
| ৭ ৮ | ৯

১৯ ২০ ২১ ১
ধাগেদেনতা থুন্নাতিট কতগদিগন ধা
১০

॥ চারগুণ ॥

(১৫¾ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪	৫	৬ ৭ ৮ ৯	১০	১১	১২ ১৩
ধা ধা দেন্ তা	কৎ	তাগে ধা দেন্ তা	কৎ	তিট	তা ধাগে
×	২	৩	৪	৫	৬

১৪ ১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
দেন্ তা	SSSধা	ধাদেন্তাকৎ	তাগেধাদেন্তা	কৎতিটতাধাগে
	৭	৮	৯	১০

২০ ২১	×
দেন্তাধুন্না তিটকতগদিগন	ধা
	১

॥ দেড়গুণ ॥

(৮ মাত্রা হতে)

১ ২ ৩ ৪	৫	৬ ৭ ৮ ৯	১০	১১
ধা ধা দেন্ তা	কৎ	তাগে ধা ধাSধা SদেনS	তাSকৎ	SতাগেS
×	২	৩	৪	৫

১২ ১৩ ১৪ ১৫	১৬	১৭	১৮
ধাSদেন্ Sতাস কৎSতিট Sতাস	ধাগেদেন	Sতাস	ধুনSনা
	৭	৮	৯

১৯ ২০ ২১	১
Sতিটস কতSগদি SগনS	ধা
১০	×

॥ কুআড়ি লয় ॥

(৪$\frac{১}{৫}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ | ৬ ৭ ৮ ৯
ধা ধা দেন্ তা | ঽধাঽঽঽ | ধাঽঽঽদেন ঽঽঽতাঽ ঽঽকৎঽঽ ঽতাঽগেঽ
× | ২ | ৩

১০ | ১১ | ১২ ১৩ ১৪ ১৫
ধাঽঽঽদেন্ | ঽঽঽতাঽ | ঽঽকৎঽঽ ঽতিঽটঽ তাঽঽঽধা ঽগেঽ দেন্ঽ
৪ | ৫ | ৬

১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ ২০ ২১ | ১
ঽঽতাঽঽ | ঽধুন্ঽঽঽ | নাঽঽঽতিট | ঽঽঽকত ঽঽগদিঽঽ ঽগনঽঽঽ | ধা
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ×

॥ বিআড়িলয় ॥

(১০ মাত্রা হতে)

১ ২ ৩ ৪ | ৫ | ৬ ৭ ৮ ৯
ধা ধা দেন্ তা | কৎ | তাগে ধা দেন্ তা ধাঽঽঽধাঽঽ
× | ২ | ৪

১১ | ১২ ১৩ ১৪ ১৫
ঽদেন্ঽঽঽতাঽ | ঽঽকৎঽঽঽতা ঽগেঽধাঽঽঽ দেন্ঽঽঽতাঽঽ ঽকৎঽঽঽতিটঽ
৫ | ৬

১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯
ঽঽতাঽঽঽধা | ঽগেঽদেন্ঽঽঽ | তাঽঽঽধুন্ঽঽ | ঽনাঽঽঽতিটঽ
৭ | ৮ | ৯

২০ ২১ | ১
ঽঽকতঽঽঽগদি ঽঽঽগনঽঽঽ | ধা
| ×

২৮ মাত্রার তাল

॥ ব্রহ্মতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—২৮। প্রতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা। ১০টি তালি (১, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৯, ২১, ২৩ ও ২৫ মাত্রায়) এবং ৪টি খালি (৩, ৯, ১৭ ও ২৭ মাত্রায়)।

॥ ঠেকা ॥

১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০
ধা তেৎ | ধেৎ কিট | তক ধুম | কিট তক | ধেৎ তা
× | ০ | ২ | ৩ | ০

১১ ১২ | ১৩ ১৪ | ১৫ ১৬ | ১৭ ১৮ | ১৯ ২০
ধেৎ তা | ধাগে তেটে | তাগে তেটে | ধুন্ না | কৎ তা
৪ | ৫ | ৬ | ০ | ৭

২১ ২২ | ২৩ ২৪ | ২৫ ২৬ | ২৭ ২৮
ধি না | ধাগে নধা | তিট কত | গদি গন
৮ | ৯ | ১০ | ০

॥ দুইগুণ ॥

(১৫ মাত্রা হতে)

১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০
ধা তেৎ | ধেৎ কিট | তক ধুম | কিট তক | ধেৎ তা
× | ০ | ২ | ৩ | ০

১১ ১২ | ১৩ ১৪ | ১৫ ১৬ | ১৭ ১৮
ধাগে তেটে | ধাতেৎ ধেৎকিট | তকধুম কিটতক | ধেৎতা ধেৎতা
৪ | ৫ | ৬ | ০

১৯ ২০ | ২১ ২২ | ২৩ ২৪ | ২৫ ২৬
ধাগে তেটে | তাগে তেটে | ধুন্না কৎতা | ধিনা ধাগেনধা
৭ | ৮ | ৯ | ১০

২৭ ২৮ | ×
তিটকত গদিগন | ধা
০ | ১

॥ তিনগুণ ॥

(১৮ই মাত্রার পর হতে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০
ধা তেৎ	ধেৎ কিট	তক ধুম	কিট তক	ধেৎ তা
×	০	২	৩	০

১১ ১২	১৩ ১৪	১৫ ১৬	১৭ ১৮
ধেৎ তা	ধাগে তেটে	তাগে তেটে	ধুন্ না
৪	৫	৬	০

১৯ ২০	২১ ২২	২৩
SSধা তেৎধেৎকিট	কতধুমকিট তকধেৎতা	ধেৎতাধাগে
৭	৮	৯

২৪	২৫ ২৬	২৭
তেটেতাগে তেটে	ধুন্নাকৎ তাধিনা	ধাগেনধাতিট
	১০	০

২৮	১
কতগদিগন	ধা
	×

॥ চারগুণ ॥

(২২ মাত্রা থেকে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০
ধা তেৎ	ধেৎ কিট	তক ধুম	কিট তক	ধেৎ তা
×	০	২	৩	০

১১ ১২	১৩ ১৪	১৫ ১৬	১৭ ১৮	১৯ ২০
ধেৎ তা	ধাগে তেটে	তাগে তেটে	ধুন্ না	কৎ তা
৪	৫	৬	০	৭

২১ ২২	২৩ ২৪
ধি ধাতেৎধেৎকিট	তকধুমকিটতক ধেৎতাধেৎ
৮	৯

২৫ ২৬	২৭ ২৮	×
ধাগেতেটে তাগেতেটে ধুন্নাকৎতা	ধিনাধাগেনধা তিটকতগদিগন	ধা
১০	০	১

॥ আড়লয় ॥

(৯$\frac{১}{৩}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০
ধা তেৎ	ধেৎ কিট	তক ধুম	কিট তক	ধেৎ sধাs
×	০	২	৩	০

১১ ১২	১৩ ১৪	১৫ ১৬
তেৎsধেৎ sকিটs	তকsধুম sকিটs	তকsধেৎ sতাs
৪	৫	৬

১৭ ১৮	১৯ ২০	২১ ২২
ধেৎsতা sধাগে	তেটেsতাগে sতেটেs	থুন্sনা sকৎs
০	৭	৮

২৩ ২৪	২৫ ২৬	২৭ ২৮	১
তাsধি sনাs	ধাগেনধা sতিটs	কতsগদি sগনs	ধা
৯	১০	০	×

॥ কুআড় লয় ॥

(৫ $\frac{৪}{৫}$ মাত্রার পর থেকে)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮
ধা তেৎ	ধেৎ কিট	তক sssধাs	ssতেৎss sধেৎsss
×	০	২	৩

৯ ১০	১১ ১২	১৩
কিটsssতক sssধুমs	ssকিটss sতকsss	ধেৎsssতা
০	৪	৫

১৪	১৫ ১৬	১৭ ১৮
sssধেৎs	ssতাss sধাsগেs	তেটেsssতা sগেsতেটেs
	৬	০

১৯ ২০	২১ ২২	২৩ ২৪
ssথুন্ss sনাsss	কsssতা sssধিs	ssনাss sধাsগেs
৭	৮	৯

২৫ ২৬	২৭ ২৮	১
নধাsssতিট sssকতs	ssগদিss sগনsss	ধা
১০	০	×

।। বিআড় লয় ।।

(১৩ মাত্রা থেকে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	তেৎ	ধেৎ	কিট	তক	ধুম	কিট	তক	ধেৎ	তা	ধেৎ	তা
		০		২		৩		০		৪	

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ধাsssতেৎss	sধেৎsssকিটs	ssতকsssধুম	sssকিটsss	তকsssধেৎss
		৫		০

১৮	১৯	২০	২১	২২
sতাsss	ধেৎssতাsssধা	sগেsতেটেsss	তাsগেsতেটেss	sধুন্sssনাs
	৭		৮	

২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
sকৎsssতা	sssধিsss	নাsssধাsগে	sনধাssতিটs	ssকতsssগদি
৯		১০		০

২৮	১
sssগনsss	ধা
	×

॥ রাবীন্দ্রিক তাল ॥

রবীন্দ্রনাথ নতুন সপ্ততালের প্রবর্তন করেন এবং এই তালগুলি কর্ণাটকী সংগীতে অজানা না থাকলেও বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই তালগুলি প্রয়োগ করেন। নিম্নে মাত্রা সংখ্যাসহ তালগুলির একটি তালিকা এবং পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হল।

	তালের নাম	মাত্রা সংখ্যা
(১)	ঝম্পক	৫
(২)	অর্দ্ধঝাঁপ	৫
(৩)	ষষ্ঠী	৬
(৪)	রূপকড়া	৮
(৫)	নবতাল	৯
(৬)	একাদশী	১১
(৭)	নবপঞ্চতাল	১৮

॥ ঝম্পক ॥

মাত্রা সংখ্যা—৫। বিভাগ—২। ১ম বিভাগে ৩টি এবং ২য় বিভাগে ২টি (৩ | ২) মাত্রা। দুইটি তালি (১ এবং ৪ মাত্রায়), খালি নাই।

॥ ঠেকা ॥

১	২	৩	|	৪	৫
ধি	ধি	না	|	ধি	না
×			|	২	

॥ অর্দ্ধঝাঁপ ॥

মাত্রা সংখ্যা—৫। বিভাগ—২। ১ম বিভাগে ২টি এবং ২য় বিভাগে ৩টি মাত্রা (২ | ৩)। দুইটি তালি (১ ও ৩ মাত্রায়), খালি নাই। কর্ণাটকী তাল রূপকমের (ত্রিস্রম্) অনুরূপ।

॥ ঠেকা ॥

১	২		৩	৪	৫
ধি	না	|	ধি	ধি	না
×			২		

॥ ষষ্ঠীতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—৬। বিভাগ—২। ১ম বিভাগে ২টি এবং ২য় বিভাগে ৪টি মাত্রা (২ | ৪)। দুইটি তালি (১ম এবং ৩য় মাত্রায়), খালি নাই। কর্ণাটকী রূপকের (চতস্রম্) অনুরূপ।

॥ ঠেকা ॥

১	২		৩	৪	৫	৬
ধি	না	|	ধি	ধি	নাগে	তেটে
			৩			

॥ রূপকড়া ॥

মাত্রা সংখ্যা—৮। বিভাগ—৩। ১ম এবং ৩য় বিভাগে ৩টি করে ও ২য় বিভাগে ২টি মাত্রা (৩ | ২ | ৩)। ৩টি তালি (১ম, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মাত্রায়), খালি নাই। কর্ণাটকী তাল মতম্ (ত্রিস্রম্)-এর অনুরূপ।

॥ ঠেকা (পাখোয়াজ) ॥

১	২	৩	|	৪	৫	|	৬	৭	৮
ধা	দেন্	তা	|	কৎ	তেটে	|	কতা	গদি	গন
×			|	২		|	৩		

॥ ঠেকা (তবলা) ॥

১	২	৩	|	৪	৫	|	৬	৭	৮
ধি	ধি	না	|	ধি	না	|	ধি	ধি	না
×			|	২		|	৩		

॥ নবতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—৯। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ৩টি, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বিভাগে ২টি করে মাত্রা (৩ | ২ | ২ | ২)। ৪টি তালি, ফাঁক নাই। কর্ণাটকী ত্রিপুট (খণ্ডম্) তালের অনুরূপ।

॥ ঠেকা (পাখোয়াজ) ॥

১	২	৩	|	৪	৫	|	৬	৭	|	৮	৯
ধা	দিন্	তা	|	কৎ	তা	|	তেটে	কতা	|	গদি	ঘেনে
×			|	২		|	৩		|	৪	

॥ ঠেকা (তবলা) ॥

১	২	৩	|	৪	৫	|	৬	৭	|	৮	৯
ধি	ধি	না	|	ধি	না	|	ধি	ধি	|	ধাগে	তেটে
×			|	২		|	৩		|	৪	

॥ একাদশী ॥

মাত্রা সংখ্যা—১১। বিভাগ—৪। ১ম বিভাগে ৩টি, ২য় ও ৩য় বিভাগে ২টি করে এবং ৪র্থ বিভাগে ৪টি মাত্রা (৩ | ২ | ২ | ৪)। ৪টি তালি, ফাঁক নাই। প্রাচীন মণিতালের অনুরূপ।

॥ ঠেকা (পাখোয়াজ) ॥

২ ৩	৪ ৫	৬ ৭	৮ ৯ ১০ ১১
ধা দিন্ তা	কৎ তাগে	দিন্ তা	তেটে কতা গদি ঘেনে
×	২	৩	৪

॥ ঠেকা (তবলা) ॥

১ ২ ৩	৪ ৫	৬ ৭	৮ ৯ ১০ ১১
ধা দিন্ তা	ধি না	ধি না	ধি ধি ধাগে ঃ তেটে
×	২	৩	৪

॥ নবপঞ্চতাল ॥

মাত্রা সংখ্যা—১৮। বিভাগ—৫টি। ১ম বিভাগে ২টি ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম বিভাগে ৪টি করে মাত্রা (২ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪)। ৫টি তালি, ফাঁক নাই। কর্ণাকটী সিংহঃ তালের অনুরূপ।

॥ ঠেকা (পাখোয়াজ) ॥

১ ২	৩ ৪ ৫ ৬	৭ ৮ ৯ ১০	১১ ১২ ১৩ ১৪	১৫ ১৬ ১৭ ১৮
ধা গে	ধা গে দিন্ তা	কৎ তাগে দিন্ তা	তেটে ধা দিন্ তা	তেটে কতা গদি ঘেনে
×	২	৩	৪	৫

॥ ঠেকা (তবলা) ॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	তেরেকেটে	ধিন্	ধা	ধাগে	ধিন্	ধিন্	ধা	তা	তেটে
×		২				৩			

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তিন্	তা	কৎ	তাগে	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা
৪				৫			

উপরি উক্ত সাতটি তাল ব্যতীত একতাল, ধামার এবং সুল-তালের প্রচলিত ছন্দ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি। যেমন—একতালে দ্বিমাত্রিকের বদলে তিনি ত্রিমাত্রিক ছন্দে ১২ মাত্রাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করেছেন (৩ | ৩ | ৩ | ৩) ; রাবীন্দ্রিক ধামারের ছন্দ বিভাগ —৩ | ২ | ২ | ৩ | ৪ এবং সুলতালের ছন্দ বিভাগে ৪ | ২ | ৪ ।

দশম অধ্যায়

॥ তাললিপি ॥

॥ ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি ॥

তবলার বর্ণগুলিকে যথাযথভাবে মাত্রা, বিভাগ, সম, তালি, খালি ইত্যাদি নির্দেশ পূর্বক লিপিবদ্ধ করাকে বলা হয় তাললিপি। গানের স্বরলিপির সাহায্যে যেমন নির্ভুলভাবে গান শেখা যায়, সেইপ্রকার তাললিপির সাহায্যে যে কোনও তাল নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করা যায়। তাই শিক্ষার্থীর পক্ষে তাললিপির জ্ঞান নিতান্ত অপরিহার্য।

তাললিপি লিপিবদ্ধ করবার একাধিক পদ্ধতি আছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র দুইটি প্রচলিত আছে -- ভাতখণ্ডে পদ্ধতি ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি। এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ভাতখণ্ডে পদ্ধতি অধিকতর সরল বলে এইটিই বহুল প্রচলিত। নিম্নে পৃথকভাবে দুইটি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হল।—

॥ ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতি ॥

(১) এক মাত্রায় একটি বর্ণ হলে কোনও চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। যেমন- ধা ধি ধি না। এখানে চার মাত্রার চারটি বর্ণ আছে তাই কোন চিহ্নের প্রয়োজন হয়নি।

(২) এক মাত্রার মধ্যে একাধিক বর্ণের সমাবেশ ঘটলে বর্ণগুলির নীচে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন (‿) দেওয়া হয়। যেমন এক মাত্রার মধ্যে দুইটি বর্ণ— ধাধি, চারটি বর্ণ— ধাধিধিনা।

(৩) এক মাত্রার অতিরিক্ত স্থায়িত্বকাল নির্দেশ করবার জন্ত ড্যাশ চিহ্ন (—) বা 'ऽ'-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

(৪) নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি সম, খালি বা ফাঁক এবং বিভাগ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়:—

সম— ×

খালি বা ফাঁক— o

বিভাগ— |

এই পদ্ধতিতে ত্রিতালটি লিখে দেখান হ'ল।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা
×				২			

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
না	তিন	তিন	না	তেটে	ধিন	ধিন	ধা
o				৩			

(৫) সম্ (×) ব্যতীত অন্তান্য তালির স্থানগুলি বর্ণের নীচে সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হয়। যেমন ত্রিতাল সম ব্যতীত—২ (৫ মাত্রায়) ও ৩ (১৩ মাত্রায়) সংখ্যাদ্বয়ের দ্বারা বুঝতে হবে। যে ত্রিতালে মোট তালির সংখ্যা হবে ৩টি।

॥ বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপি পদ্ধতি ॥

(১) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভগ্নাংশ এবং পূর্ণ মাত্রা বোঝাবার জন্ত পৃথক পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন—

১/৮	মাত্রার	চিহ্ন	‿‿
১/১৬	,,	,,	‿‿‿‿
১/৪	,,	,,	‿
১/৩	,,	,,	‿‿‿
১/২	,,	,,	o
১	,,	,,	—
২	,,	,,	S
৪	,,	,,	×

(২) নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি সম, খালি বা ফাঁকের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন—

সম— ১

খালি বা ফাঁক— +

(৩) সমের অতিরিক্ত যে যে মাত্রায় তালি হবে সেই মাত্রার নিম্নে তারই সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়। নিম্নে এই পদ্ধতিতে সুরফাঁক তালটি (সুলতাল) লিখে দেখান হল। এই তালটিতে ১, ৪ এবং ৭ মাত্রায় তালি।

ধা	ধা	ধিন্	তা	কি	ট	ধা	কি	ট	ত	ক	গ	দি	গ	ন
—	—	—	—	o	o	—	o	o	o	o	o	o	o	o
১		+		৪			৭				+			

আর একটি উদাহরণ :

একতাল মাত্রা ১২ (১, ৪, ৯, ১১ মাত্রায় তালি)

ধিন্	ধিন্	ধা	গে	তেরেকেটে	তু	না	ক	ত্তা	ধা	গে	তেরেকেটে	ধি	না
—	—	o	o	‿‿‿‿	—	—	—	—	o	o	‿‿‿‿	—	—
১					৪		+		৯			১১	

॥ পাশ্চাত্য তাললিপি পদ্ধতি ॥

পাশ্চাত্য দেশে তাল বা মাত্রাকে সময় (Time) হিসাবে ধরা হয় এই সময় কে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা— (১) সরল সময় (Simple Time) এবং মিশ্র সময় (Compound Time)। বিভিন্ন ছন্দানুসারে সরল সময়কে (Simple Time) আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

(১) সিম্পল্ ডুপ্‌ল্ টাইম (Simple Duple Time)

বা

ডাব্‌ল্ মেজার (Double Measure)—২/২ ছন্দ।

(২) সিম্পল্ ট্রিপ্‌ল্ মেজার (Simple Triple Measure)—

৩/৩ ছন্দ।

(৩) সিম্পল্ কোয়াড্রুপ্‌ল্ মেজার (Simple Quadruple Measure)— ৪/৪ ছন্দ।

ডুপ্‌ল্ এবং কোয়াড্রুপ্‌ল্‌কে (Duple and Quadruple) কখনও কখনও কমন টাইমও (Common Time) বলা হয়।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে তাল বিভাগের মত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও সময় বিভাগ করা হয় একটি দণ্ডের মত রেখার (|) সাহায্যে এবং ওই রেখাটিকে বলা হয় (Bar)। একই রচনায় (Composition) প্রত্যেকটি বারের (Bar) স্থায়িত্ব অর্থাৎ সময়কাল সমান। তাই কোন সুর আরম্ভের প্রথমেই অর্থাৎ Key Signature-এর ঠিক পরেই বারের সময় নির্দেশক দুইটি সংখ্যা থাকে এবং এই সংখ্যা দুইটিকেই বলা হয় Time Signature। এই সংখ্যা দুইটি একটি উপরে এবং একটি নীচে থাকে, যেমন— $\frac{২}{২}$। নিম্নস্থ সংখ্যাটি স্বরের প্রতীক, উপরস্থ সংখ্যাটি একটি বারের অন্তর্গত স্বর সংখ্যার নির্দেশক। "The under figure represents a note, the upper shows how many such notes there are in a bar". [Elements of Music—F. Davenport, P. 32]। উপরি উক্ত তিনটি সরল সময়ের মিলিত রূপকেই বলা হয় মিশ্র সময় বা Compound Time।

"The time signature is therefore expressed by figures, showing how many notes next in value—i.e., quavers—there in the bar $\frac{6}{8}$. Such a time is called "Compound". [Elements of Music—F. Davenport, P. 33].

মিশ্র সময়ে (Compound time) দুইটি সংখ্যার উপরের সংখ্যাটি সরল সময়ের (Simple time) সংখ্যাটি অপেক্ষা তিনগুণ হয় এবং নিম্নস্থ সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন—

ডুপ্‌ল্‌ টাইম (*Duple time*)

সরল						মিশ্র				
২	২	২	২	২		৬	৬	৬	৬	৬
২	৪	৮	১৬	৩২		২	৪	৮	১৬	৩২

ট্রিপ্‌ল্‌ টাইম (*Triple time*)

৩	৩	৩	৩	৩		৯	৯	৯	৯	৯
৩	৪	৮	১৬	৩২		৩	৪	৮	১৬	৩২

কোয়াড্রুপ্‌ল্‌ টাইম (*Quadruple time*)

৪	৪	৪	৪	৪		১২	১২	১২	১২	১২
২	৪	৮	১৬	৩২		২	৪	৮	১৬	৩২

প্রত্যেকটি স্বরের স্থায়িত্বের সময়ানুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিহ্ন আছে। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রা সম্পন্ন স্বরটিকে বলা হয় সেমিব্রিভ (Semibreve)। নিম্নে একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল।

নাম	মাত্রা সংখ্যা	চিহ্ন
১) সেমিব্রিভ (Semibreve)	= ১	
২) মিনিম (Minim)	= ১/২	
৩) ক্রচেট (Crotchet)	= ১/৪	
৪) কোয়েভার (Quaver)	= ১/৮	
৫) সেমিকোয়েভার (Semiquaver)	= ১/১৬	
৬) ডেমিসেমিকোয়েভার (Demisemiquaver)	= ১/৩২	
৭) সেমিডেমিসেমিকোয়েভার (Semidemisemiquaver)	= ১/৬৪	

অর্থাৎ ১টি সেমিব্রিভ=২টি মিনিম=৪টি ক্রচেট=৮টি কোয়েভার =১৬টি সেমিকোয়েভার=৩২টি ডেমিসেমিকোয়েভার=৬৪টি সেমিডেমি-সেমিকোয়েভার।

একাদশ অধ্যায়

॥ কতিপয় তবলা বাদকের জীবনী ॥

॥ কণ্ঠে মহারাজ ॥

১৮৮০ সালে বারাণসীর এক সংস্কৃতিবান পরিবারে কণ্ঠে মহারাজের জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই তবলা বাদনে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। বারাণসী ঘরাণার প্রবর্তক পণ্ডিত রামসহায়জীর প্রপৌত্র পণ্ডিত বলদেব সহায় কণ্ঠে মহারাজের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা এবং আন্তরিকতা দেখে তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নেন। এইভাবে ৭।৮ বছর থেকেই নিয়মিতভাবে কণ্ঠে মহারাজের শিক্ষা-পর্ব শুরু হয় এবং একাদিক্রমে প্রায় ২২।২৩ বছর তিনি গুরুর সযত্ন তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-লাভ করেন। তাঁর শিক্ষাকালের মধ্যেই গুরু বলদেব সহায়জী নেপাল দরবারে নিযুক্ত হয়ে নেপাল চলে যান। কণ্ঠে মহারাজও গুরুর বিচ্ছেদে কাতর হয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে নেপালে যেয়ে হাজির হন। শিষ্যের এই শ্রমসহিষ্ণুতা দর্শনে প্রীত গুরু নিজের বিদ্যা উজাড় করে শিষ্যকে প্রদান করেন। কণ্ঠে মহারাজও কঠিন পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা গুরু-প্রদত্ত সকল কিছুই সম্যকভাবে অধিগত করেন। দিনে ১৭।১৮ ঘণ্টা পরিশ্রমে তাঁর তর্জনী ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও তিনি সমানভাবে রিয়াজ করেছেন। এই অসামান্য ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠার জন্য তবলা বাদক হিসাবে শীঘ্রই তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীত সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং অচিরেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে সমর্থ হন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি-স্বরূপ সংগীত নাটক আকাদেমী তাঁকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত কিষণ মহারাজ ইতিমধ্যেই সর্বভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর অন্যান্য শিষ্য-দের মধ্যে সর্বশ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকিশোর গাঙ্গুলী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ বাদন-শৈলী ॥

কণ্ঠে মহারাজের বাদন-শৈলীর মধ্যে বেনারস ঘরাণারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তবে নিজ প্রতিভা এবং পরিশ্রমের জন্য বিভিন্ন লয়কারীর কাজ, গৎ, পরণ ইত্যাদির অধিকতর সুষ্ঠু প্রয়োগে তিনি ছিলেন পারদর্শী।

॥ হবীবুদ্দীন খাঁ ॥

উস্তাদ হবীবুদ্দীন খাঁ ১৮৯১ সালে মীরাট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বংশ অজরাড়া ঘরাণার প্রতিনিধিস্থানীয় বলে পরিগণিত হত। কল্লু খাঁ এবং মীরু খাঁ প্রতিষ্ঠিত অজরাড়া ঘরাণার তবলা বাদকদের মধ্যে উস্তাদ চাঁদ খাঁ, কালে খাঁ, হস্সু খাঁ ইত্যাদি সুবিখ্যাত ছিলেন। হস্সু খাঁয়ের পুত্র শম্মু খাঁ এবং শম্মু খাঁয়ের পুত্র হবীবুদ্দীন খাঁ। হবীবুদ্দীনের পিতা শম্মু খাঁ এই ঘরাণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া ছিলেন।

১২ বৎসর হতে তিনি পিতার কাছে তালিম নেওয়া আরম্ভ করেন এবং মাত্র চার বৎসর পিতার কাছে তাঁর শিক্ষার সুযোগ হয়। ১৯১৫ সালে পিতার মৃত্যু হলে হবীবুদ্দীনের শিক্ষায় ছেদ পড়ল। নতুন গুরুর জন্য অনুসন্ধান করতে করতে দিল্লীর বিখ্যাত তবলিয়া খলিফা উস্তাদ নথ্থু খাঁয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নথ্থু খাঁয়ের কাছে তিনি একাদিক্রমে দশ বৎসর তবলা শিক্ষা করেন।

দীর্ঘকাল শিক্ষা-অন্তে নানা সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি অতি অল্পদিনেরে মধ্যেই গুণী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন এবং সর্বভারতীয় বিখ্যাত তবলীয়াদের মধ্যে নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন করে নেন। তিনি আকাশবাণীতে যোগদান করে তাঁর অনবদ্য একক বাদনে সকলকে চমৎকৃত করেছেন।

বাদন-শৈলী

উস্তাদ হবীবুদ্দীন খাঁ প্রধানতঃ অজরাড়া ঘরাণার ধারক এবং বাহক হলেও নথ্থু খাঁয়ের প্রভাবে দিল্লী-ঘরাণার বাজেও দক্ষতা অর্জন করেন। তাই তাঁর বাদন শৈলীতে অজরাড়া এবং দিল্লীর মিশ্রিত রূপ দেখা যায়। তাই তাঁর গৎ, পেশকার, কায়দা ইত্যাদি সকল কিছুতেই একটা স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। একক বাদনে কিংবা লড়ন্ত সংগতে তিনি তাঁর অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেছেন।

॥ অহমেদজান থিরকুয়া ॥

১৮৯২ সালে উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ নামক স্থানে অহমেদ জান থিরকুয়া জন্মগ্রহণ করেন। অহমেদজান যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বহু পূর্ব থেকেই তাঁদের সাংগীতিক ঐতিহ্য ছিল। তাঁর পিতা উস্তাদ হুসেন বক্স খাঁ সারেঙ্গী বাদক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

অতি অল্প বয়সে পিতার কাছে সারেঙ্গী বাদনে তার প্রথম হাতেখড়ি। কিন্তু সারেঙ্গী অপেক্ষা তবলার প্রতিই যেন অহমেদ জানের পক্ষপাতিত্ব বেশী দেখা যেতে লাগল। অবশ্য এর কারণও ছিল এবং তবলা বাজাবার প্রেরণা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে মাতুল কুল হতে পান। কারণ তাঁর দুই মাতুল উস্তাদ বসৎ খাঁ ও উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ বিশিষ্ট তবলা বাদক ছিলেন। অতএব তবলার প্রতি আগ্রহ দেখে তাঁর পিতা তাঁকে মাতুলদের কাছে তবলা শিক্ষা করবার জন্য দিলেন। কিছুকাল মাতুলদের কাছে তবলা শিক্ষা অন্তে তিনি তিনি মীরাটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক মুনীর খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছে দীর্ঘ ২৪।২৫ বছর তালিম নেন।

সুদীর্ঘ কালের সাধনায় তবলা বাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে তিনি নানা সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হলেন। অচিরেই তাঁর গুণমুগ্ধ রামপুরের নবাব তাঁকে নিজ দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে তিনি প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত করেন। এর পর তিনি ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠে (তৎকালীন লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ) তবলার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন ও আট বৎসর কাল অধ্যাপনা করে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

অহমেদজান তাঁর সুযোগ্য শিক্ষকতায় বহু খ্যাতনামা শিল্পী তৈরী করেছেন। তাঁর তিন পুত্র ইতিমধ্যেই তবলা বাদনে যথেষ্ট সুনাম

অর্জন করেছেন। নবীজান, আলীজান ও মহম্মদজান—এই তিন পুত্র ব্যতীত অন্যান্যদের মধ্যে বাংলার ছানু গাঙ্গুলী, লক্ষৌর রোজভি লায়ল, মেহবুব খাঁ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

তবলা বাদনে অহমদজান সাহেবের দক্ষতায় চমৎকৃত হয়ে উস্তাদ আব্‌দুল আজীজ খাঁ সাহেব তাঁকে "থিরকুয়া" উপাধি দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি কানপুর সংগীত ভারতী হতে "সংগীত মার্তণ্ড" এবং এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে "আফ্‌তাবী মৌসিকী" উপাধি পান। প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে "পদ্মশ্রী" উপাধিতে ভূষিত করেন।

॥ বাদন-শৈলী ॥

উস্তাদ মুনীর খাঁর কাছে দীর্ঘকাল তালিম নেবার জন্য থিরকুয়া সাহেবের বাদনে দিল্লী ঘরাণার প্রভাবই সর্বাধিক। তাই তাঁর বাদনে চাঁটির প্রয়োগ-মাধুর্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাঁয়া এবং তবলার সম-প্রাধান্য তাঁর বাদন-শৈলীকে অধিকতর শ্রুতিমধুর করেছে। তাছাড়া কায়দা, পেশ্‌কার ইত্যাদির বিধিসম্মত প্রয়োগ এবং ছোট ছোট মুখ্‌ড়া, মোহ্‌রা বা লয়ের কাজ তাঁর বাদন-শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দিল্লী-ঘরাণা ব্যতীত ফরুখাবাদ এবং অন্যান্য ঘরাণার বাদন পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর বিশেষভাবে পরিচয় ছিল বলে তাঁর বাদন-শৈলী একদিকে যেমন সমৃদ্ধ অপরদিকে তেমনই বৈচিত্রমণ্ডিত। তর্জনী এবং মধ্যমার বিশেষ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্য তাঁর বাদন মিষ্টত্বে অতুলনীয়।

শ্রীকেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৬ সাল। স্থান—ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হল। রাত ১টা। মহাসমারোহে চলেছে All Bengal Music Conference। নামে All Bengal হলেও এখানে সর্বভারতীয় প্রখ্যাত শিল্পী-সমাবেশ ঘটেছে। উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব সবেমাত্র তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেছেন। উস্তাদজীর কিন্নর কণ্ঠের সুরের যাদুতে সমগ্র শ্রোতৃ মণ্ডলী সম্মোহিত। সকলেরই মনে হচ্ছে যে এর পর আর কিছু শুনবার বা শোনাবার থাকতে পারে না এবং সেই চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য; কারণ সুরের এই অনাস্বাদিত পরিমণ্ডল ভেদ করে তা' শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না। এমন সময় ঘোষক কণ্ঠে শোনা গেল যে এবার আসরে আসছেন সেতারের যাদুকর এনায়েৎ খাঁ সাহেব এবং তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক শ্রী কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই মুহূর্তে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মাইক অসহযোগিতা সুরু করল। এই পরিবেশে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির সাফল্য সম্বন্ধে সকলেরই মনে আশঙ্কা। যাই হোক খাঁ সাহেব সেতারে ঝঙ্কার তুললেন, প্রস্তুত হয়ে বসলেন চিন্তান্বিত কেশব বাবু। বাজনা কিছুটা অগ্রসর হতেই শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল, সকলেই উৎকর্ণ হয়ে দুই প্রধানের বাজনা শুনতে লাগলেন। একদিকে আত্মসমাহিত সাধক খাঁ সাহেব, অপরদিকে বহু অভিজ্ঞ তবলার যাদুকর কেশব বাবু। মাইকের সাহায্য ব্যতীতই প্রায় দুই ঘণ্টা বাজাবার পর যখন খাঁ সাহেব তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করলেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ হর্ষোৎফুল্ল শ্রোতৃমণ্ডলী দুই শিল্পীকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়ে সম্মানিত করলেন। এর পর থেকেই একজন উচ্চকোটীর তবলা বাদক হিসাবে কেশব বাবুর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন মুড়াপাড়া গ্রামে ৬ই জানুয়ারী, বুধবার, ১৮৯২ সালে এক সম্ভ্রান্ত বংশে কেশব বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ৺পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকা শহরে ৺পূর্ণচন্দ্রের নিজস্ব বাটী ছিল এবং তিনি একজন বর্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন।

এই পরিবারে সংগীতকে আবাহন করেন কেশব বাবুর পিতামহ ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন তবলা বাদক ছিলেন। তাঁর পিতাও একজন দক্ষ হারমোনিয়াম বাদক ছিলেন। পিতৃ বন্ধু ব্রাহ্ম সমাজের ৺চন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে মাঝে মাঝে গৃহে সংগীতের আসরও বসত। তাই দেখা যায় শৈশবকাল হতেই পিতার একমাত্র সন্তান কেশব বাবু একটি সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে মানুষ হয়েছেন। মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সংগীতের স্ফুরণ দেখা যায় এবং এই সময় শিশু কেশব চন্দ্রের খোল বাজাবার প্রচেষ্টায় আত্মীয় স্বজন সকলেই অবাক হয়ে যেতেন। পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি রীতিমত কীর্তনের সঙ্গে সংগত করেন। এরপর ৮/৯ বছর বয়সে বিখ্যাত ৺ভগবান দাস সেতারীর ভাগিনেয় যদুনাথ দাসের কাছে সেতারে তাঁর হাতেখড়ি হয়। যদুনাথ দাসের পরে স্বয়ং ভগবান দাস সেতারীর কাছে তিনি ৪/৫ বছর সেতারে তালিম নেন।

কিন্তু সেতার বেশীদিন তাঁকে আকর্ষণ করে রাখতে পারল না। তাই ১২ বছর বয়সেই তিনি আগ্রা ঘরাণার প্রতিনিধিস্থানীয় উস্তাদ আতাহোসেন খাঁয়ের শিষ্য ৺প্রসন্ন বণিকের কাছে তবলায় তালিম নেওয়া সুরু করেন এবং প্রায় ১২ বছর তাঁর শিক্ষাধীনে থাকেন। পরে তিনি আনোখেলালের গুরুভাই বেনারসের মৌলবীরাম মিশ্রের কাছে চার বছর তবলা শিক্ষা করেন। সর্ব্বশেষে দিল্লী ঘরাণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি উস্তাদ নাথু খাঁয়ের কাছে তিনি প্রায় আড়াই বছর তালিম নেন এবং উস্তাদজী এই সময় ঢাকায় তাঁদের বাড়ীতেই কিছুকাল অবস্থান করেন।

সংগীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষায় তাঁর অগ্রগতিও ব্যাহত হয়নি। ইংরাজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত তাঁর বিদ্যাচর্চা

অব্যাহতভাবে চলেছিল। শিক্ষা ছাড়াও কণ্ঠসংগীতের সামান্য কিছু চর্চা তিনি করেছিলেন, তবে তা নিতান্তই সখের জন্য।

তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের একজন শিল্পী ছিলেন এবং নানা সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তার মধ্যে ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সালে All Bengal Music Conference ও ১৯৪৪ সালে All India Music Conference উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫—৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি Allahabad Music Conference-এ জজিয়তি করেন। তাছাড়া ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত Music Competition-এ জজিয়তি করেছেন। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন।

খেলাধুলায় এবং সমাজ সেবক হিসাবে ও তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের Vice-President এবং ১৯৩০ হতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা পূর্ব Bengal Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন।

তিনি ভারত বিখ্যাত বহু শিল্পীর সঙ্গেই সংগত করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে ডি, ভি, পালুসকর, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনঝঙ্কার, গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্তী, জমিরুদ্দীন খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপচাঁদ বেদী, উমর খাঁয়ের পিতা সেখায়েৎ খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, হাফেজ আলি খাঁ, ভি, জি, যোগ, পান্নালাল ঘোষ, রামকিষন মিশ্র, বিনায়ক রাও পটবর্ধন ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেশববাবুর প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়ে ১৯৪৪ সালে ব্রজেন্দ্র কিশোর স্মৃতি সমিতি তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং ১৯৪৪ সালে সুরেশ সংগীত সংসদ তাঁকে "Musician of Bengal in Tabla" বলে সম্বর্ধিত করে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

অশীতিপর বয়স্ক এই জ্ঞানবৃদ্ধ সংগীত-সাধক আজও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করে সংগীতের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

॥ বাদন শৈলী ॥

কেশব বাবুর বাদন শৈলীর মধ্যে দিল্লী বাজের প্রভাবই সব থেকে বেশী। তবে বিভিন্ন ঘরাণার একাধিক উস্তাদের সংস্পর্শে আসবার জন্য প্রায় প্রত্যেকটি ঘরাণার প্রভাব তাঁর উপর পড়েছে। সেইজন্য পরবর্তী কালে বাদনে তাঁর একটি নিজস্ব রীতি (Style) গড়ে উঠেছে।

॥ উস্তাদ মসিত খাঁ ॥

১৮৯৪ সালে উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদে মসিত খাঁ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল নন্নে খাঁ। নন্নে খাঁ ফরুখাবাদ ঘরাণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক ছিলেন। রামপুরের রাজা তাঁকে নিজের দরবারে সসন্মানে নিযুক্ত করেন এবং তখন হতেই এই পরিবার রামপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

মসিত খাঁ তাঁর পিতার শিক্ষাধীনে থেকে এবং কঠোর পরিশ্রম করে তবলা বাদনে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এলাহাবাদের সংগীত সম্মেলনে তরুণ তবলা বাদক মসিত খাঁ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক ফুলঝুরি সেই সম্মেলনে তাঁর বাজনা পরিবেশন করবার পর যখন অন্য কোনও তবলা-বাদক আসরে বসতে সাহস পেলেন না, তখন শ্রোতাদের মধ্য থেকে এগিয়ে এলেন আত্মনির্ভর তরুণ সাধক উস্তাদ মসিত খাঁ। বিস্মিত সন্দিগ্ধ শ্রোতারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বাজনা শুনতে লাগলেন এবং অনুষ্ঠান-অন্তে সমবেত সাধুবাদে মুখর হলেন।

উস্তাদ মসিত খাঁ রামপুর হতে কোলকাতায় এসে বসবাস সুরু করেন। তাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রাইচাঁদ বড়াল মুন্নে খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তার সুযোগ্য পুত্র উস্তাদ কেরামত উল্লা খাঁ বর্তমানে সর্বভারতে একজন প্রথম শ্রেণীর তবলা বাদক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন।

॥ বাদন-শৈলী ॥

শুষ্ক উস্তাদী অপেক্ষা বাজনায় তিনি মিষ্টত্বের পক্ষপাতি ছিলেন। তাই ফরুখাবাদ ঘরাণা তাঁর হাতে এক নবরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। তাঁর অনমুকরণীয় প্রয়োগ পদ্ধতিতে তথা হস্ত-কৌশলে কায়দা, পেশকার, রেলা কিংবা লয়-বৈচিত্র্যের সহজ সরল রূপায়ণ এবং গতি-মাধুর্য তবলা বাদনে এনেছিল এক নতুন বৈশিষ্ট্য।

॥ হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী ॥

হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী ১৯১১ সালে কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নামছিল মন্মথ নাথ গাঙ্গুলী। ভবানীপুর অঞ্চলের এই গাঙ্গুলী পরিবার ছিল শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান। হীরু বাবুর পিতা মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কোলকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার হিসাবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ তাত (মন্মথ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সুরথ নাথ গাঙ্গুলী হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং মাতামহ রজনীকান্ত ভট্টচার্য কোলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই পরিবারটির সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যও উল্লেখনীয়। হীরুবাবুর পিতা একজন উত্তম তবলা বাদক ছিলেন। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত তবলা বাদক বাবু খাঁয়ের কাছে তালিম নেন। মাতামহ রজনীকান্ত সংগীতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনী। তিনি আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক তথা কর্ণধার ছিলেন। তিনি নিজের দুই পুত্র কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু) ও শ্যাম গাঙ্গুলীকে সংগীত চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দেন এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ প্রথমজন তবলায় এবং দ্বিতীয়জন স্বরোদ বাজনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন এবং সর্বভারতে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবেই হীরু বাবুর মধ্যে শৈশব হতেই সংগীত প্রীতি জাগ্রত হয় এবং পিতার উৎসাহে তবলা বাজনার প্রথম হাতেখাড়ি তাঁর কাছেই হয়। তাঁর পিতা কেবলমাত্র নিজ পুত্রকেই নয়, সংগীতের প্রসারার্থে বিনা পারিশ্রমিকে বহু ব্যক্তিকেই তবলা শিক্ষা দিতেন। তখনকার দিনে অপাংক্তেয় সংগীতকে এইভাবে অকুতোভয়ে জনসমাজে প্রচার করা নিঃসন্দেহে গাঙ্গুলী পরিবারের এক বৈপ্লবিক কীর্তি বলে অভিহিত করা যায়।

হীরুবাবু নিজের সহজাত প্রতিভা এবং আন্তরিক প্রযত্নের দ্বারা তবলা বাদনে সম্যক অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখলেন। কিছুকাল পিতার

কাছে শিক্ষার পর তিনি পিতার গুরুভাই নগেন্দ্রনাথ বসুর কাছে পাঁচ বৎসর কাল তালিম নেন এবং সর্বশেষে একাদি ক্রমে ১২।১৩ বৎসর লক্ষ্ণৌয়ের ভারত বিখ্যাত তবলা বাদক খলিফা আবিদ হোসেনের কাছে শিক্ষালাভ করেন। এর মধ্যে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলছিল এবং তিনি একে একে ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ., বি. এ, বি. এল. এবং এটর্নিশিপ পরীক্ষাদিতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

তাঁর কর্মজীবন ও শিল্পীজীবন সমান্তরাল ভাবে পাশাপাশি চলল। তবলা-বাদনে ধীরে ধীরে তিনি সারা ভারতে সুনাম অর্জ্জন করেন এবং অজস্র সংগীত সম্মেলনে তার অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৫০ সালে কোলকাতার অন্যতম সম্রান্ত সংগীতচক্র "ঝঙ্কার" তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সম্মান সূচক "ডক্টর অব মিউজিক" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৯৫০ সালে কলিকাতা পৌর সংস্থা নাগরিকদের পক্ষ থেকে তাকে পৌর সম্বর্দ্ধনা জানান।

বর্তমানে এই নিরহঙ্কার, অমায়িক শিল্পী মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংগীতের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রকৃত জিজ্ঞাসু ছাত্রকে বিদ্যাদানে কার্পণ্য করেন না।

॥ বাদন শৈলী ॥

হীরুবাবুর বাদন শৈলীতে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার প্রাধান্যই সর্ব্বাধিক। তাঁর বিজ্ঞানসম্মত হস্ত চালনায় বোল, কায়দা, পেশকার, লয়কারীর কাজ প্রভৃতির মধ্যে একটি অনায়াস মাধুর্যের প্রকাশ দেখা যায়। পাঞ্জাব বাজের মত তার পরিবেশিত বন্দিশে খোলা এবং জোরদার আওয়াজের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

॥ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ॥

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে Jack of all trades, master of none। কিন্তু সব কিছুরই যেমন ব্যতিক্রম আছে, এই প্রবাদটিরও ব্যতিক্রম আছে এবং বর্তমান সংগীতাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র শ্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষ তার সুস্পষ্ট উদাহরণ। তবলা-বাদন ব্যতীত যা কিছুতেই তিনি মনোনিবেশ করেছেন, সে ক্রীড়াতেই হোক বা চিত্রাঙ্কন হোক, সাফল্যের চাবিকাঠি তিনি করতলগত করেছেন। কেবলমাত্র বিধির নির্বন্ধে তাকে নানা পথ পরিক্রমান্তে সংগীতকেই বেছে নিতে হয়েছে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে এবং মনে হয় সংগীত জগতের সমৃদ্ধির জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

শুভ ২৫শে বৈশাখ। ১৩১৬ সালের এই দিনটিতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধক জ্ঞান প্রকাশ জন্মগ্রহণ করেন। ২৫শে বৈশাখ দিনটি আর একটি কারণে বাঙালীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে; কারণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ১৮৬১ সালের এই দিনটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানবাবুর পিতার নাম কিরণচন্দ্র ঘোষ এবং পিতামহের নাম ছিল দ্বারকানাথ ঘোষ। দ্বারকানাথ ঘোষই বর্তমানের সুপরিচিত ডোয়ার্কিন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারে সাংগীতিক পরিবেশের মধ্যেই জ্ঞানবাবুর শৈশব অতিবাহিত হয়। তার পিতা একজন বিদগ্ধ সংগীত রসিক ছিলেন, পিতামহ ছিলেন দক্ষ বেহালা বাদক এবং খুল্লতাত শরৎ ঘোষ উচ্চস্তরের পিয়ানো বাদক ছিলেন।

পরিবেশের গুণে সুরের প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথমদিকে সুরের নেশা তাকে তাঁর লক্ষ্য থেকে অর্থাৎ শিক্ষাজীবন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। একটির পর একটি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতার জন্য শেষ পর্যন্ত স্নাতকোত্তর পাঠ তাকে অসমাপ্ত রাখতে হল। শিক্ষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কন এবং ক্রিকেট খেলাতেও তিনি পারদর্শিতা অর্জন

করেন এবং এই সময়েই চিত্রশিল্পী হবার একটা গোপন বাসনা তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিধি নির্দিষ্ট পথেই অর্থাৎ চিত্রশিল্পীর পরিবর্তে সংগীত শিল্পী হিসাবে তাঁর পদচারণা আরম্ভ করতে হল।

মাত্র সাত বছর বয়সেই টনিবাবুর শিক্ষাধীনে তবলা বাদনে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি হয়। তারপর একে একে শিক্ষাগুরু হিসাবে তিনি পেয়েছেন আজিম খাঁ, মজিদ খাঁ এবং ফিরোজ খাঁ সাহেবকে। বিশেষ করে মজিদ খাঁ সাহেব তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখে প্রিয়তম শিষ্যকে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন।

যার মধ্যে নিরন্তর অনির্ব্বাণ জ্ঞানস্পৃহা রয়েছে কেবল মাত্র তবলা বাদনে তার তৃপ্তি আসা সম্ভব নয়। তাই এই অতৃপ্ত শিল্পী সংগীতের নানা ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভ তথা জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হলেন। তবলা ব্যতীত অবনদ্ধ বাদ্য খোলের তালিম নেন তিনি পণ্ডিত নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে এবং পখাবজের তালিম নেন বিপিন বাবুর কাছে।

তাঁর সংগীত জীবনের দ্বিতীয় পর্ব্বে সুরু হল গান শেখা। সংগীতের একটি শাখায় দক্ষতা অর্জ্জন করলে বিশেষ করে ছন্দ তথা তালে, অন্যান্য শাখায় সাফল্য অপেক্ষাকৃত সহজতর হয় এবং তার সঙ্গে প্রতিভার স্পর্শ থাকলে তো কথাই নেই। তাই জ্ঞান বাবুও অচিরেই এই শাখায় তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হলেন। তাঁর সংগীত গুরু ছিলেন রামপুরের বিখ্যাত উস্তাদ শব্বন খাঁ এবং সগীর খাঁ। উস্তাদ খুশি মহম্মদের কাছে তিনি নেন হারমোনিয়াম বাজনার তালিম। ক্রমে ক্রমে তাঁর শিক্ষা তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয় গীটার এবং বেহালা।

শিক্ষাঅন্তে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই শিল্পী এইবার নিজেকে নিয়োজিত করলেন সৃষ্টিকার্যে। রেকর্ড সংগীতে গীটার প্রয়োগের পরিকল্পনার তিনিই উদ্ভাবক এবং তিনি নিজে শচীনদেব বর্মন, উমা বসু প্রভৃতি একাধিক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে গীটারে সহযোগিতা করে এর সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। কোলকাতা আকাশবাণীর সংগীত বিভাগ তাঁর দীর্ঘকালের সক্রিয় সহযোগিতায় উন্নত হতে উন্নততর হয়েছে। লঘু সংগীতের প্রযোজক হিসাবে জ্ঞানবাবুর সুযোগ্য পরিচালনা এবং

পরামর্শে আকাশবাণীর সংগীতানুষ্ঠানগুলির একদিকে যেমন মান উন্নত হয়েছে, অপরদিকে তেমনই সেগুলিতে তিনি আমদানী করেছিলেন বৈচিত্র্যের। এই আকাশ বাণীতে সর্ব্বপ্রথম 'বাণীসঙ্ঘ' কর্ত্তৃক যে ঐকতান বাদন অনুষ্ঠিত হয়, জ্ঞানবাবু বেহালা বাদক হিসাবে সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। আকাশবাণী ব্যতীত তিনি ভারতের বহু সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রতিভার গুণে অচিরেই সর্বভারতীয় প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৫৪ সালে ভারতের সাংস্কৃতিক দলের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। সম্প্রতি আকাশবাণীর চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করে পেনসিল্‌ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারতীয় সংগীতের অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন। আকাশবাণী এবং সংগীত সম্মেলনাদি ব্যতীত চলচ্চিত্রের সংগীতেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং বসন্তবাহার, যদুভট্ট, প্রভৃতি চিত্র তার সার্থক উদাহরণ।

শিক্ষক হিসাবেও তিনি যোগ্যতা অর্জন করেছেন। দীর্ঘকালের সংগীত জীবনে তিনি অজস্র ছাত্র-ছাত্রী তৈরী করেছেন এবং তাঁদের সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। বর্তমানে এই অক্লান্ত সাধক জ্ঞান বিতরণে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। এক কথায় বলতে গেলে তবলা-বাদক হিসাবে জ্ঞানবাবুর অবিসম্বাদিত প্রতিষ্ঠা তাঁর বহুমুখী সংগীত প্রতিভার প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং হয়েছে সার্থক উত্তরণের দিশারী।

॥ বাদন-শৈলী ॥

জ্ঞানবাবুর বাদন-শৈলী সম্পূর্ণভাবে ফরুখাবাদ ঘরাণায় দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সে সত্ত্বেও বিভিন্ন উস্তাদের কাছে তালিম নেবার জন্য এবং নিজের সহজাত প্রতিভার গুণে প্রায় প্রত্যেকটি ঘরাণার বাজ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল। তাই তাঁর বাদনে নূতনত্বের সঙ্গে ফরুখাবাদের মিষ্টত্বের সংমিশ্রণ এক অনন্যতা এনে দিয়েছে। গাব, কানি এবং বাঁয়ার কাজের সমাঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ কলায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

॥ কেরামৎ খাঁ ॥

১৯১৭ সালে এই যে কেরামৎ খাঁ জন্ম গ্রহণ করেন তঁার পিতার নাম উস্তাদ মসিত খাঁ।

খাঁ সাহেব শৈশব হতে নিজের পিতার কাছেই তালিম নেন এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও অধ্যবসায়ের জন্য অতি অল্প বয়সেই তবলা বাদনে দক্ষতা অর্জন করেন। কেবলমাত্র ফরূখাবাদ ঘরাণা নয়, অন্যান্য ঘরাণার অনেক কিছুই তঁার জানা আছে।

বর্তমানে যে কোনও সংগীত সম্মেলনে খাঁ সাহেবের উপস্থিতি শ্রোতাদের বিশেষভাবে উদ্দীপিত করে এমনই তার জনপ্রিয়তা। কেবল শ্রোতৃবৃন্দ নয়, তাঁর হাতের সুমধুর সংগতে শিল্পীও বিশেভাবে অনুপ্রাণিত হন। খাঁ সাহেবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, যে কোনও শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতায় অর্থাৎ সংগতের অপূর্ব মেজাজে। তিনি কোন সময়েই নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে শিল্পীর রসভঙ্গ বা মেজাজ নষ্ট করেন না। একক বাদনেও খাঁ সাহেবকে এক কথায় অনন্য বলা চলে।

কোলকাতার আকাশবাণীর সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীত সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করে তিনি প্রভূত সুনামের অধিকারী হয়েছেন। তাছাড়া ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিধিনি দলের সঙ্গে তিনি অষ্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন।

এখনও তিনি সংগীতের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তঁার সুযোগ্য শিক্ষাদানে অনেকেই ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে নিখিল ঘোষ, অনিল রায় চৌধুরী, ফকির মহম্মদ ইত্যাদির নাম উল্লেখ যোগ্য।

॥ বাদন শৈলী ॥

পিতার সকল কিছুর উত্তরাধিকার হিসাবে খাঁ সাহেবের মধ্যেও ফরুখাবাদ ঘরাণার সকল বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর বোল-গুলি স্পষ্ট, সুমিষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। নিজ ঘরাণার সঙ্গে অন্যান্য ঘরাণার কিছু মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি তাঁর বাদন শৈলীতে নূতনত্বের আমদানী করেছেন। এক কথায়, খাঁ সাহেবকে বলা যায় ফরুখাবাদ ঘরাণার সার্থক উত্তরাধিকার।

॥ উস্তাদ আল্লারাখা ॥

১৯১৫ সালে পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জিলার রতনগড় গ্রামে এব কৃষক পরিবারে আল্লারাখার জন্ম হয়। সাধারণ কৃষক পরিবারের মত তাঁর পিতাও চেয়েছিলেন যে আল্লারাখা কৃষিকাজেই পিতার সহযোগিতা করবেন। কিন্তু সংগীতের প্রতি সহজাত আকর্ষন থাকায় তিনি পিতার মতানুবর্তী না হয়ে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে পাঠানকোটে একটি নাটক কেম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উস্তাদ কাদির বখ্‌সের শিষ্য উস্তাদ লাল মহম্মদের কাছে তবলা এবং কণ্ঠ-সংগীত চর্চা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে চাকুরী পরিত্যাগ করে নিজ জন্মস্থান গুরুদাসপুরে এসে তিনি একটি সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু অর্থাভাবে প্রতিষ্ঠানটি তিনি চালাতে পারলেন না। সংগীত প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবার কিছুদিন পরে তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে লাহোর চলে যান এবং উস্তাদ কাদের বখ্‌শের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১২।১৩ বছর কাদের বখ্‌শের কাছে শিক্ষালাভ করে একজন সফল তবলা-বাদক হিসাবে আল্লারাখা আত্মপ্রকাশ করেন। রেকর্ড কোম্পানী এবং আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। পরে তিনি বোম্বে চলে যান এবং এ. আর. কুরেশী নাম নিয়ে ছায়াচিত্র জগতে সংগীত পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং অশেষ খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ভারতের আল্লারাখা আজ বিদেশের সংগীত-রসিক মহলে একটি সুপরিচিত নাম। ১৯৬০ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক আয়োজিত সংগীত সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

কেবলমাত্র তবলা-বাদনে নয়, কণ্ঠসংগীতেও তাঁর দক্ষতা আছে। তাঁর কণ্ঠ সুরেলা এবং বিশেষ করে পাঞ্জাবী ঠুংরীতে তিনি পারদর্শী।

॥ বাদন-শৈলী ॥

আল্লারাখার বাদনে পাঞ্জাব বাজের বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। বোল-গুলি পাখোয়াজ-ঘেসা হবার জন্য তাঁর আওয়াজ বেশ গম্ভীর। পেশকার কায়দা ইত্যাদি বেশ বড় এবং জটিল হলেও পরিবেশনার গুণে অর্থাৎ সাবলীল প্রয়োগ-নৈপুন্যের জন্য খুবই শ্রুতিমধুর।

॥ পণ্ডিত অনোখেলাল মিশ্র ॥

১৯১৪ সালে বেনারসে অনোখেলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল বুদ্ধু প্রসাদ। বাল্যকালেই অনোখেলাল পিতা-মাতাকে হারান এবং মাতামহীর কাছে মানুষ হন।

বেনারস ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত রাম সহায়জীর প্রশিষ্য পণ্ডিত ভৈরোঁ মহারাজের কাছে অনোখেলাল মাত্র ছয় বৎসর বয়স থেকেই তবলা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অব্যাহতভাবে তাঁর শিক্ষাকার্য্য চলে। মাত্র ২১।২২ বছরে অনোখেলাল সফল তবলা-বাদক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

একক বাদন অথবা গায়ক, বাদক কিংবা নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে সমান দক্ষতায় তিনি তবলা বাজাতে পারতেন। তাই অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সারা ভারতে যথেষ্ট যশ ও সম্মান লাভ করেন। বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে ও আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি সাফল্যের সঙ্গে তবলা বাজনা পরিবেশন করেন।

শিক্ষক হিসাবেও অনোখেলালের বিশেষ যোগ্যতা ছিল। নিজ পুত্র রামজী মিশ্রকে তিনি যথাযথ তালিম দিয়ে ইতিমধ্যেই একজন সুবাদক তৈরী করেছেন। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে মহাপুরুষ মিশ্র, লছমীকান্ত, রামলাল মিশ্র প্রভৃতি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

১৯৫৮ সালের ২রা মার্চ পণ্ডিত অনোখেলালের মৃত্যু হয়।

॥ বাদন-শৈলী ॥

বেনারস ঘরাণার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য পণ্ডিত অনোখেলালের বাদ্যে সুস্পষ্ট হলেও তাঁর প্রয়োগ কৌশলে কিছু স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। তাঁর হস্তকৌশলে গৎ, কায়দা, পেশকার ইত্যাদি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর মনে হত। বিশেষ করে ত্রিতাল তালের স্পষ্ট এবং দ্রুতবাদনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

॥ আবিদ হুসেন খাঁ ॥

১৮৬৭ সালে লক্ষ্ণৌএ আবিদ হুসেন খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহম্মদ খাঁ। আবিদ হুসেনের পিতা লক্ষ্ণৌ ঘরাণার একজন প্রতিনিধিস্থানীয় তবলা-বাদক ছিলেন।

শৈশবে পিতার কাছেই আবিদ হুসেনের তবলা শিক্ষার হাতে-খড়ি হয় এবং মাত্র পাঁচ বৎসর তিনি পিতার শিক্ষাধীনে ছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। অতঃপর তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উস্তাদ মুন্নে খাঁর কাছে প্রায় বার বৎসর তালিম নেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাবতীয় কলা-কৌশল আয়ত্ত করেন।

উস্তাদ আবিদ হুসেন তবলা-বাদনে সারাভারতে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন এবং তাঁকে "খলিফা" উপাধি দেওয়া হয়। অজস্র সংগীত সম্মিলনে ইনি সাফল্যের সঙ্গে তবলা-বাজনা পরিবেশন করেন। কিছুকাল তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠে (পূর্বেকার লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ) অধ্যাপনার কাজ করেছিলেন। তাঁর শিষ্য-বৃন্দের মধ্যে অনেকেই সারাভারতে খ্যাতিলাভ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল—বাংলার হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী (হীরুবাবু), বেনারসের বীরু মিশ্র, ইন্দোরের জাহাঙ্গীর খাঁ ইত্যাদি। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌয়ে তিনি পরলোকগমন করেন।

॥ বাদন-শৈলী ॥

লক্ষ্ণৌ ঘরাণার সার্থক উত্তরসাধক হিসাবে উস্তাদ আবিদ হুসেন নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ বাজের সকল বৈশিষ্ট্যই তাঁর বাদন-শৈলীতে সুপরিস্ফুট ছিল। দক্ষিণ হস্তের পরিবর্তে বাম হস্তে তিনি তবলা বাজাতেন এবং অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন লয়কারীর কাজ প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন।

॥ পণ্ডিত সামতাপ্রসাদ ॥

ভারতের শ্রেষ্ঠ তবলা বাদকদের মধ্যে পণ্ডিত সামতা প্রসাদ এক অবিস্মরণীয় নাম। ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই সামতা প্রসাদ বারানসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বাচা মিশ্র, পিতামহের নাম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং প্রপিতামহ ছিলেন বিখ্যাত প্রতাপ মহারাজ। সামতা প্রসাদের আর একটি নাম ছিল "গদাই মহারাজ।"

বারাণসীর মিশ্র পরিবার তবলা বাদনে একদিকে যেমন ছিলেন বিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী, অপরদিকে ছিলেন তেমনই একাধিক সৃষ্টি শীল প্রতিভার জন্মদাতা। পিতাই ছিলেন সামতা প্রসাদের প্রসাদের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাগুরু; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র সাত বৎসর বয়সে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তার শিক্ষাপর্ব সাময়িকভাবে ব্যাহত হল কিন্তু রুদ্ধ হল না। তিনি বলদেব সহায়ের শিষ্য পণ্ডিত বিক্কু মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং নতুন উদ্যমে সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন। শোনা যায় যে, তিনি দিনের পর দিন ১৭।১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত রিয়াজ করেছেন। জন্মগত প্রতিভার সঙ্গে একনিষ্ঠ সাধনা অচিরেই সিদ্ধিকে তাঁর করতলগত করল।

১৯৪২ সাল। এলাহবাদ সংগীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেন ২১ বৎসরের যুবক শান্তাপ্রসাদ। ভারত-বিখ্যাত গুণীজনের সমাবেশ হয়েছে সেই সম্মেলনে। এই ধরণের বৃহৎ সম্মেলনে শান্তাপ্রসাদের প্রথম অংশ গ্রহণ, তাই তাঁর মনে নানা আশঙ্কার কাল মেঘ। কিন্তু সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং গুরুর আশীর্বাদে তিনি সসম্মানে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং এই সম্মেলনেই প্রথম শ্রেণীর তবলা বাদক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এরপর সুরু হল তাঁর একের পর এক জয়যাত্রা—দেশে এবং বিদেশে। কোলকাতা, বোম্বাই, গোয়ালিয়র, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে অতি অল্পকালের মধ্যেই সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ তবলা বাদকদের মধ্যে তিনি নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন করে নিলেন। হিন্দী ও বাংলা ছায়াচিত্রের সংগীতাংশে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। যে সকল ছায়াচিত্রে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে 'ঝনক ঝনক

পায়েল বাজে', 'বসন্ত বাহার', 'অসমাপ্ত', 'ঢুলী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিদেশেও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির জয়ধ্বজা উড্ডীন করে তার গৌরব বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে ভারত সরকার তাঁকে বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দলের অন্যতম সদস্য মনোনিত করে পাঠিয়েছেন। বিশেষ করে লণ্ডনে এডিনবরার সাংগীতিক উৎসবে শান্তাপ্রসাদের তবলা-বাদন সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে।

তবলার যাদুকর পণ্ডিত সামতা প্রসাদ নিজের দুই পুত্র কুমার লাল ও কৈলাসকে তবলা শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত ইতিমধ্যেই উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলী তৈরী করেছেন যাঁদের মধ্যে নবকুমার পণ্ডা, সত্যনারায়ণ বশিষ্ঠ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

কেবলমাত্র তবলা-বাদনে নয়, সংগীতেও তাঁর দক্ষতা আছে এবং ঠুংরী গান তাঁর বিশেষ প্রিয়। গীত বাদ্য ব্যতীত নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতেও তিনি সমভাবে পারদর্শী।

বর্তমানেও যে কোনও সংগীতের আসরে পণ্ডিত সামতা প্রসাদের উপস্থিতি গুণীজন মহলে বিশেষ উৎসাহ জাগ্রত করে এবং তিনিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনায়াস দক্ষতার দ্বারা শিল্পী এবং শ্রোতৃবৃন্দকে সমভাবে তৃপ্ত করেন। সদানন্দময় এই শিল্পী দীর্ঘজীবন লাভ করে সংগীত জগৎকে আরও সমৃদ্ধ করুন—আজ সকলেরই এই কামনা।

॥ বাদন শৈলী ॥

পণ্ডিত সামতা প্রসাদের বাদন শৈলীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) তিনি বেনারস ঘরাণার সার্থক উত্তর সাধক।
(২) স্পষ্ট এবং জোরদার আওয়াজ অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
(৩) হস্তকৌশলে বাদন মাধুর্য অধিকতর পরিস্ফুট।
(৪) জড়তাবিহীন স্বচ্ছন্দ গতি মনমুগ্ধকর।
(৫) কায়দা, পেশকার লগ্‌গী এবং বিশেষ করে ছন্দের কাজে তার দক্ষতা অপরিসীম।
(৬) বিভিন্ন বাজের প্রয়োগ নৈপুণ্যে বাদন শৈলীতে নূতনত্বের আমদানী।

॥ লালজী শ্রীবাস্তব ॥

২৪শে নভেম্বর, ১৯২৪ সালে এলাহবাদের এক বধিষ্ণু পরিবারে লালজী শ্রীবাস্তবের জন্ম হয়। তাঁর পোষাকী নামছিল উদয়ভান কিশোর; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ডাক নাম 'লালজী' নামেই পরিচিত হন। লালজীর পিতা রাজকিশোর উত্তর প্রদেশ সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সেই লালজীর পিতৃবিয়োগ হয় এবং মাতার সমযত্ন তত্ত্বাবধানে লালজীর শৈশব এবং কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়।

বাল্যকাল হতেই লালজীর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়, কিন্তু পরিবারে সংগীত চর্চার কোন ঐতিহ্য না থাকায় এ বিষয়ে তিনি বিশেষ সহায়তা কিংবা উৎসাহ পাননি। যাই হোক ১৭ | ১৮ বৎসর বয়সে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল এবং তিনি ছতরপুরের বিখ্যাত উস্তাদ ইউসুফ্ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লালজীর ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে খাঁ সাহেব তাকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে তালিম দেন চার বৎসর কাল লালজী খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষাধীন ছিলেন। এদিকে সাধারণ শিক্ষা পর্যায়েও তার ছেদ পড়েনি। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করবার পর পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তিনি সংগীত সাধনায় সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে পরিবারের সম্মতি না থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা লালজীর ইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারেন নি। যাই হোক এইভাবে গুরুর সাহায্য ছাড়াই ২ | ৩ বছর গৃহেতেই তিনি রিয়াজ করেন। এই সময় বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক পণ্ডিত শ্যামলাল এলাহবাদ এসে কয়েক বছর বসবাস করেন। লালজী কালবিলম্ব না করে পণ্ডিত শ্যামলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রায় তিন বৎসর তার কাছে তালিম নেন। কিন্তু তিন বছর পর শ্যামলালজী বারাণসী প্রত্যাবর্তন করলে আবার তিনি সমস্যায় পড়লেন এবং নতুন গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। তাঁর সৌভাগ্য বশতঃ জয়পুরের বিখ্যাত তবলিয়া পণ্ডিত জয়লাল সেই সময় (১৯৪৭) এলাহবাদ এলেন এবং

লালজী পণ্ডিত জয়লালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁর শিক্ষাধীনে থাকেন। দুই বসর পর পণ্ডিত জয়লাল এলাহবাদ পরিত্যাগ করলে লালজী আর গুরুর সন্ধান না করে ইতিমধ্যে তাঁর অধিগত বিদ্যাকে ত্রুটিহীন করবার জন্য কটোর সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

লালজী এইবার নানা সংগীত অনুষ্ঠান ও সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই তবলা বাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৫০ সালে কানপুরের ললিত কলা বিদ্যাপীঠের দ্বারা তিনি "আচার্য" পদবীতে ভূষিত হন। এলাহবাদ প্রয়াগ সংগীত সমিতিতে দীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। এঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীর নাম—বুলাকীলাল যাদব, প্রভুদত্ত বাজপেয়ী, গিরীশচন্দ্র শ্রীবাস্তব ইত্যাদি।

॥ বাদন শৈলী ॥

বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে শিক্ষা করবার জন্য লালজীর পরিচয় হয়েছিল বিভিন্ন বাজ তথা ঘরোয়ানার সঙ্গে এবং সেইজন্য তাঁর বাদন শৈলীও নূতনভাবে পরিশীলিত হয়েছিল। পূরব ও পশ্চিম বাজের সংমিশ্রণে তার বাদন শৈলীতে এসেছে এক অভিনবত্ব এবং এই বাদন শৈলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, একে সমভাবে গীতে ও নৃত্যে প্রয়োগ করা চলে, অর্থাৎ এই বাদনশৈলী গীত এবং নৃত্য উভয়েরই উপযোগী। তাঁর বাদনে পেশকার, রেলা, কায়দা, বিস্তার ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগ—নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তাছাড়া একই মাত্রা সংখ্যায় বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগেও তিনি পারদর্শী। সবশেষে তাঁর বাদন শৈলীর উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে দ্রুত এবং অতি দ্রুতলয়ে সঠিক অঙ্গুলীচালনার মাধ্যমে বোলের স্পষ্ট রূপায়ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ প্রবন্ধাবলী ॥

॥ সংগীতে লয় তথা তাল মাহাত্ম ॥

সংগীতে লয় বা তাল অবিচ্ছেদ্য অংশ। লয় তথা তালের মাহাত্ম আলোচনা করবার পূর্বে লয় এবং তালের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংগীতে নিয়মাবদ্ধ ছন্দকেই আমরা 'তাল' বলতে পারি। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সময় বিভাগানুযায়ী সাংগীতিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হলে তাকে তালবদ্ধ সংগীত বলা হয়। আবার এই তালের মধ্যে কাল ও ক্রিয়ার সাম্যতা ঘটলে তাকে বলা হয় লয়। "তালঃ কালক্রিয়ামানং লয়ঃ সাম্য যথাস্ত্রিয়াং"। প্রচলিত অর্থে, সংগীতে গতিকেই লয় আখ্যা দেওয়া হয় এবং সংগীতের প্রকৃতি অনুযায়ী এই লয়েরও প্রকারভেদ আছে। সাধারণভাবে বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত— লয়ের এই তিন প্রকার গতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কেবল মাত্র সংগীতে নয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি নির্দিষ্ট লয়ে আবদ্ধ। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি সবই একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী একই নিয়মে ২৪ ঘন্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে আসছে। সূর্যোদয় তথা সূর্যাস্ত বা দিবা রাত্রির সংঘটন নিয়ম-বহির্ভূত কোন প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। মনুষ্যের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি, শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াদি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলেছে। এই চলার ব্যাপারে তখনই বিপর্যয় দেখা দেয় যখন তালভঙ্গ হয়। তালমাহাত্ম বর্ণনা করতে যেয়ে 'রাগ কল্পদ্রুম'কার বলেছেন—

"উৎপত্ত্যাদি ত্রয়ং লোকে যতস্তালেন জায়তে।
কীটকাদি পশূনাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ॥
যানি কানি চ কর্ম্মানি লোকে তালাশ্রিতানি চ।
আদিত্যাদি গ্রহানাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ"॥

অর্থাৎ, ত্রিজগতের সবকিছুর উৎপত্তি তালের বা লয়ের দ্বারা হওয়ার জন্য কীটাদি ও পশুসমূহের গতিও ওই নির্দিষ্ট তালের দ্বারাই পরিচালিত হয়! জগতের সবকিছু ক্রিয়াদি উক্ত সুনির্দিষ্ট লয়ের বা তালের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অতএব জগতে বিনা তালে লয়ে কোনও ক্রিয়াদিই সম্ভব নহে।

সংগীতে লয় বা তালের প্রয়োগ জাগতিক কার্যাদির মত নিয়ম বহির্ভূত কিছু নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে সংগীতের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাল সৃষ্টি হয়েছে সংগীতেরই প্রয়োজনে। এর প্রমাণ আমরা পাই আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্র, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদির মধ্যে। ডমরুপাণি মহাদেবের কল্পনা তালোৎপত্তির প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন। বেদে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতা, অজন্তার দেওয়াল চিত্র, প্রাচীন মন্দিরগাত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির নানা বাদ্যযন্ত্রের ছবি উৎকীর্ণ করা আছে। এই সকল বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে কয়েকটির নাম আমরা জানি। যেমন বৈদিক যুগে আমরা পাই বনস্পতি, দর্দুর, আঘাতি, আদম্বর, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ইত্যাদি, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে পাই পর্ণব, মুরজ, ভেরী, পটহ, মর্দল, নন্দী ইত্যাদি। সংগীতে লয়ের প্রয়োজনেই এই সকল বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ এবং বৈচিত্র্য।

সংগীতের লয় প্রাকৃতিক লয়ের মত একই ছন্দে আবর্তিত নয়। লয় বৈচিত্র্য সংগীতের একটি অন্যতম সর্ত। তাই সংগীতে নানা ছন্দের লয় দেখা যায় এবং ছন্দবৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন লয়কে সুবিধানুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় সীমিত করে তাকে একাধিক বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এই ভাবে যে তালগুলি সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি পৃথকীকরণের জন্য তাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে, যেমন—লক্ষ্মীতাল, ব্রহ্মতাল, চৌতাল, ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি।

সংগীতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাল অপরিহার্য। তাল মাহাত্মের জন্যই সংগীত হয়েছে সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং গতিশীল। তাল-লয়হীন সংগীতকে একটি নিষ্প্রাণ মনুষ্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। জীবন যেমন ছন্দোময়, তাল সংগীতকে সেইপ্রকার ছন্দোময় করেছে। তাল লয়যুক্ত সংগীত মানুষ তো দূরের কথা পশু-পাখীর হৃদয়েও এক অনাস্বাদিত আনন্দের শিহরণ এনে দেয়। তাই বলা হয় যে সংগীতের দ্বারা হিংস্র পশুকেও বশে আনা যায়।

তালের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মানুগ পথেই সংগীতের পূর্ণতা সাধন হতে পারে। অন্যথায় সংগীত অপূর্ণ থেকে যায়। তাই বেতাল নৃত্য, গীত বা বাদ্য কাঁরও প্রাণে সাড়া জাগান তো দূরের কথা বিরক্তিতে মন আচ্ছন্ন করে। উচ্চকোটীর শিল্পী তাঁকেই বলা হয় যাঁর অন্যান্য গুণের সঙ্গে লয়-কুশালতা বিদ্যমান।

সুতরাং সুপ্রাচীন কাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা দেখি যে সংগীতে অপ্রতিহত ভাবে তাল তার প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ একদিকে যেমন বাদ্য যন্ত্রাদির বিবর্তন ঘটছে অপরদিকে তেমনই নানা তাল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। কারণ সংগীতের শৃঙ্খলা, সংযম, মাধুর্য্য সকলই তালের উপর নির্ভরশীল।

"ভক্তি রত্নাকর"—প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন,

"গীতে তালযুক্ত তালবিনা শুদ্ধি নয়।
যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয়"॥

॥ অপ্রচলিত তালকে প্রচলিত করবার উপায় বা আবশ্যকতা ॥

নতুন সৃষ্টির দ্বার যখন ক্ষণেকের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়, অথচ গতানুগতিকতায় শিল্পীমন অতৃপ্ত তখন পুরাতনকে নতুনের মর্যাদা দিয়ে পুনরায় আবাহন করে আনা হয়। তাল প্রক্রিয়াদিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। রাগ রাগিনীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে এক এক সময় অপ্রচলিত রাগের অত্যাধিক্য ঘটে। কারণ প্রচলিত রাগ গায়নে যখন শিল্পী বা শ্রোতা কেউই তৃপ্ত হয় না তখন নূতনত্বের প্রয়োজনে প্রচলিতের মাঝে অপ্রচলিতদের আগমন ঘটে।

নির্বাসিত তাল অর্থাৎ যে তালগুলিকে একেবারেই ব্যবহার করা হয় না সেইগুলিকে আমরা অপ্রচলিত তাল বলি এবং বহুল ব্যবহৃত তালগুলিই প্রচলিত তালের দলে পড়ে। তবে বহুল প্রচলিত একাধিক তালের মধ্যে আবার কয়েকটির প্রাধান্য অত্যধিক বেশী, যেমন—দাদ্রা, কাহারবা, ত্রিতাল এবং একতাল। অপ্রচলিত তালগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে দুই একটি শোনা গেলেও অধিকাংশ বর্তমানে পরিত্যক্ত, যেমন— শিখর, গণেশ, লক্ষ্মী, ব্রহ্মতাল ইত্যাদি। অল্প প্রচলিত তথা প্রায় অপ্রচলিত তালাদির মধ্যে ঝুমরা, আড়া চৌতাল, সুলতাল ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

অপ্রচলিত তালগুলিকে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রচলিত করা চলতে পারে :—

(১) ধীরে ধীরে প্রচলিত তালাদির মধ্যে অপ্রচলিত তাল-গুলির অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে।

(২) তবলা বা পখাবজের একক বাদনে (Solo) অপ্রচলিত তালগুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৩) বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অপ্রচলিত তালে গায়ন বা বাদনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৪) প্রয়োগ সহ আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করে সংগীত প্রেমীদের অপ্রচলিত তালের মাহাত্ম্য অনুধাবনে সহায়তা করতে হবে।

(৫) রেডিওতে অপ্রচলিত তালের গীত এবং বাদ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৬) অপ্রচলিত তালোপযোগী গীত রচনা করতে হবে।

(৭) সংগীত বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে অপ্রচলিত তালগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেইগুলি শিক্ষাদানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) সর্বোপরি, অপ্রচলিত তালে নিপুণ শিল্পীকে পুরস্কৃত কিংবা অন্যভাবে সম্মানিত করে উৎসাহ দিতে হবে।

অপ্রচলিত তালগুলিকে প্রচলিত করবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলে একমত নন। একদলের মতে এর আবশ্যকতা আছে এবং বিপক্ষদলের মতে এর কোনও আবশ্যকতা নেই। প্রথম দল তাঁদের মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান:—

(১) সংগীতে নতুনত্বের প্রয়োজনে অপ্রচলিত তালগুলিকে প্রচলিত করতে হবে।

(২) অপ্রচলিত তালগুলি আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্যের দ্যোতক। অতএব এগুলি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

(৩) জ্ঞানকে প্রচলিত তালাদির মধ্যে সীমিত না রেখে অপ্রচলিত তালের আলোচনা এবং প্রয়োগ করে তার পরিধি বিস্তার করা উচিত।

দ্বিতীয় অর্থাৎ বিপক্ষদল উপরি উক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন—

(১) প্রচলিত তালের সংখ্যা এত অধিক যে সবগুলিকে সমানভাবে প্রয়োগ করতে পারলে নতুনত্বের জন্য অপ্রচলিত তাল আমদানী করবার কোন আবশ্যকতা নেই। প্রচলিত তালগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে অধিক প্রাধান্য দেবার জন্যই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

(২) অপ্রচলিত তালগুলি যুগোপযোগী নয়।

(৩) মৃতকে পুনর্জীবন দেবার প্রচেষ্টা না করে সময়োপযোগী নতুন সৃষ্টি করা উচিত; কারণ নতুন নতুন সৃষ্টির দ্বারা আমাদের সংগীত জগৎ সমৃদ্ধ হতে আরও সমৃদ্ধতর হবে।

দুটি মতই আলোচনা করে আমাদের মনে হয় যে নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন সব সময় থাকলেও অপ্রচলিত তালগুলির প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এইগুলিকে যুগোপযোগী করে নেওয়া যায় কিনা সেকথা তাল বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। পরিচিতদের মধ্যে হঠাৎ নতুন কোনও আগন্তুক এলে কিছু যে অবাক বিস্ময়ের সঞ্চার হয় সেকথা অনস্বীকার্য।

॥ আধুনিক তাল তথা প্রাচীন তাল ॥

ভারতীয় সংগীতে প্রাচীন কাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত তালের একটি ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে এবং এই বিবর্তনের জন্য কিছু কিছু প্রাচীন তাল লুপ্ত হয়ে গেছে এবং কয়েকটির রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে সাধারণভাবে প্রাচীন তালগুলির ভিত্তির উপরেই আধুনিক তালগুলির কাঠামো দণ্ডায়মান।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে আমরা দুই প্রকার তালের উল্লেখ পাই—মার্গতাল ও দেশীতাল। মার্গসংগীতে ব্যবহৃত তালগুলিকে মার্গতাল এবং দেশী সংগীতে ব্যবহৃত তালগুলিকে বলা হত দেশীতাল। বিভিন্ন মাত্রাসংখ্যা সম্পন্ন নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার মার্গতালের উল্লেখ পাওয়া যায়:—

তালের নাম	মাত্রাসংখ্যা
(১) চাচপুট :	৬
(২) উদঘট্ট :	৬
(৩) চচ্চৎপুট :	৮
(৪) ষট্‌পিতাপুত্রক :	১২
(৫) সম্পর্কেষ্টাক :	১২

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, মহাদেবের পাঁচটি মুখ—সত্তজাতঃ, বামদেবঃ, অঘোরঃ, তৎপুরুষঃ এবং ঈসানোঃ হতে উপরিউক্ত পাঁচটি তাল উৎপন্ন হয়েছে।

প্রাচীন মার্গ বা গন্ধর্ব তালে, লঘু, গুরু ও প্লুত—এই তিন প্রকার মাত্রা এবং দেশীতালে লঘু, গুরু, প্লুত ও দ্রুত—এই চার প্রকার মাত্রার প্রচলন ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে আমাদের তাল পদ্ধতিতে দেখা যায় ছয় প্রকার মাত্রার প্রচলন, যথা লঘু=১ মাত্রা, গুরু=২ মাত্রা, প্লুত =৩ মাত্রা, কাকপদ=৪ মাত্রা, দ্রুত=½ মাত্রা এবং অনুদ্রুত=¼ মাত্রা। হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে উপরিউক্ত কাকপদ বাদে অপর পাঁচটি প্রকার

মাত্রার উল্লেখ আছে। মাত্রা ব্যতীত প্রাচীন তালের দশটি বিষয় উল্লেখ করে তাদের তালের 'দশপ্রাণ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যথা:—কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি এবং প্রস্তার।

(বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান কালে ভারতীয় সংগীতে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দক্ষিণ ভারতের পদ্ধতিকে বলা হয় কর্ণাটকী পদ্ধতি এবং উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিকে বলা হয় হিন্দুস্থানী পদ্ধতি। নিম্নে সংক্ষেপে এই দুটি পদ্ধতি সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

॥ কর্ণাটকী তাল পদ্ধতি ॥

কর্ণাটকী তাল পদ্ধতি ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে প্রধান সাতটি তালে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে এই পদ্ধতিতে ১০৮টি তালের ব্যবহার ছিল যাকে বলা হত অষ্টত্তরশততালম্। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০৮টি তাল কমে এসে ৫৬টি তালে দাঁড়ায় এবং তখন একে বলা হত অপূর্ব-তালম্ এবং এই ৫৬টি তাল হতে বর্তমানে ৭টি প্রধান তাল ব্যবহৃত হচ্ছে যাদের বলা হয় সপ্ততালম্।

(বিস্তারিত আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

॥ হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতি ॥

কর্ণাটকী তাল পদ্ধতি হতে আধুনিক হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। কর্ণাটকী পদ্ধতিতে তাল বিভাগে ফাঁকের কোন স্থান নেই, কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে 'ফাঁক'-এর একটি বিশেষ স্থান আছে। মোটামুটি ভাবে তালের সমতা রক্ষার্থেই ফাঁকের ব্যবহার করা হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই পদ্ধতিতে পাঁচ প্রকার মাত্রার প্রয়োগ করা হয়। সমগ্র হিন্দুস্থানী তালকে তিস্র, চতশ্র এবং মিশ্র—এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। ত্রিমাত্রিক ছন্দের তালগুলি তিস্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন দাদরা। চতুর্মাত্রিক ছন্দের তালগুলি চতশ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন

কাহারবা বা ত্রিতাল এবং অন্যান্য তালগুলি মিশ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন তীব্রা (৩।২।২) ঝাঁপতাল (২।৩।২।৩) ইত্যাদি।

আধুনিক কালে গীতের প্রকার অনুযায়ী বিভিন্ন তালের প্রয়োগ হয়। যেমন—ধ্রুপদাঙ্গের গানে চৌতাল, ধামার ইত্যাদি, খেয়ালাঙ্গের গানে ত্রিতাল, একতাল ইত্যাদি, ঠুংরী অঙ্গে যৎ, আদ্ধা ইত্যাদি, টপ্পা অঙ্গে পাঞ্জাবা, যৎ ইত্যাদি এবং লঘু সংগীতে দাদ্রা, কাহারবা ইত্যাদি। সাধারণতঃ তালগুলি উপরি উক্তভাবে ব্যবহৃত হলেও একাধিক তাল আছে যা একাধিক অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন—ঝাঁপতাল ধ্রুপদাঙ্গে ও খেয়ালাঙ্গে, ত্রিতাল খেয়ালাঙ্গে ও ঠুংরী অঙ্গে, যৎ ঠুংরী অঙ্গে ও টপ্পা অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আধুনিক তালগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ছন্দানুযায়ী এক একটি তালের বিশেষ গতি আছে, কারও বা বিলম্বিত, কারও বা মধ্যগতি, কারও বা দ্রুতগতি।

আধুনিক ও প্রাচীন তাল পদ্ধতি বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাচীন কাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তালের রূপগত, গুণগত তথা পদ্ধতিগতভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

॥ পাশ্চাত্য সংগীতে তালের স্থান ॥

ভারতীয় সংগীতে গীত বা বাদ্যের সঙ্গে তালের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকলেও এর মধ্যে তাল রহিত অংশও আছে, যেমন—আলাপচারী। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতে তালের সঙ্গে সংপর্ক-বিহীন অংশ নেই, কারণ সেখানে ভারতীয় সংগীতের মত কোনও আলাপচারী করা হয় না। তাই পাশ্চাত্য সংগীতে তালের গুরুত্ব খুবই বেশী।

ভারতীয় সংগীতে মাত্রাসংখ্যা এবং ছন্দানুযায়ী অজস্র তালের সৃষ্টি হয়েছে এবং গীত, বাদ্য বা নৃত্যের ছন্দানুযায়ী বিশেষ বিশেষ তাল তাতে প্রয়োগ করা হয়। অবনদ্ধ-জাতীয় বাদ্যগুলি এই তালকার্য সাধিত করে। তাই ভারতীয় তাল পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। পাশ্চাত্য সংগীতে তাল ব্যবস্থা এত জটিল নয়। কারণ সেখানে তাল বা

মাত্রাকে সময় (Time) হিসাবে পরিগণিত করা হয়। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তাল বিভাগের মত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও এই সময় বিভাগ করা হয় একটি দণ্ডের মত রেখার সাহায্যে। এই রেখাগুলিকে বলা হয় BAR। যে কোনও রচনায় (Composition) একটি বার (BAR) হতে অপর বার (BAR)-এর দূরত্ব সমান রাখা হয়; অর্থাৎ প্রত্যেকটি বারের সময়কাল বা স্থায়িত্ব সমান। প্রত্যেকটি বারের বা প্রতিবিভাগের সময়কাল কতটা হবে স্বরলিপির প্রথমেই দুটি সংখ্যার সাহায্যে তার নির্দেশ দেওয়া থাকে এবং এই সংখ্যাদুটিকে বলা হয় টাইম সিগনেচার (Time Signature)। এই দুটি সংখ্যার মধ্যে উপরের সংখ্যাটিই একটি বার বা বিভাগের অন্তর্গত স্বর সংখ্যার নির্দেশক।

পাশ্চাত্য সংগীতে তাল বিভাগগুলির মধ্যে কোনও জটিলতার অবকাশ নেই। কারণ তাঁরা সময়কে (Time) দুটি ভাগে বিভক্ত করে একটির নাম দিয়েছেন সরল সময় (Simple Time) এবং অপরটির নাম দিয়েছেন মিশ্র সময় (Compound Time)। সরল সময়ের (Simple Time) আবার তিনটি উপবিভাগ আছে, যথা—

(১) ২।২ ছন্দের তালকে বলা হয় সিম্পল্ ডুপ্‌ল্ টাইম (Simple Duple Time) বা ডাব্‌ল্ মেজার (Double Measure)।

(২) ৩।৩ ছন্দের ছন্দের তালকে বলা হয় সিম্পল্ ট্রিপ্‌ল্ মেজার (Simple Triple Measure)।

(৩) ৪।৪ ছন্দের তালকে বলা হয় সিম্পল্ কোয়াড্রুপ্‌ল্ মেজার (Simple Quadruple Measure)।

উপরি উক্ত ডুপ্‌ল্ (Duple) এবং কোয়াড্রুপ্‌ল্‌কে (Quadruple) আবার কখনও কখনও বলা হয় কমন টাইম (Common Time)।

প্রত্যেকটি স্বর কত মাত্রা স্থায়ী হবে সেটি বোঝাবার জন্য পাশ্চাত্য সংগীতে স্বরগুলির বিভিন্ন নাম এবং চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যেমন—

১ মাত্রা = সেমিব্রিভ (Semibreve)

$\frac{1}{2}$,, = মিনিম (Minim)

$\frac{1}{4}$,, = ক্রচেট (Crotchet)

$\frac{1}{8}$,, = কোয়েভার (Quaver)

$\frac{1}{16}$,, = সেমি কোয়েভার (Semiquaver)

$\frac{1}{32}$,, = ডেমিসেমিকোয়েভার (Demisemiquaver)

$\frac{1}{64}$,, = সেমিডেমিসেমিকোয়েভার (Semidemisemiquaver)

ভারতীয় তালগুলির মধ্যে বহু তাল আছে যেগুলির অসম বিভাগ। পাশ্চাত্যেও অসম বিভাগসম্পন্ন তাল আছে, কিন্তু সেগুলির প্রয়োগ খুবই সীমিত।

> "In rare instances, irregular times are to be met with, such as alternate bars of $\frac{3}{4}$ and $\frac{2}{4}$ or the two joined together, making $\frac{5}{4}$". (Elements of Music—E. Devenport, P-31).

পাশ্চাত্য সংগীতে তালের অপ্রতিহত প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় সংগীতে তালের প্রাধান্য থাকলেও তা সবত্রই গীত বাদ্য বা নৃত্যানুসারী। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতে তাল ও সুর হাত ধরাধরি করে চলেছে, একটির অভাবে অপরটি পঙ্গু। তালের এই প্রাধান্যের জন্য তালবিভাগ বা সময় বিভাগকে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত করা হয়েছে। তালের জন্য পাশ্চাত্য দেশে আমাদের মত অবনদ্ধ জাতীয় কোনও বাদ্যযন্ত্র নেই, তাঁরা ব্যবহার করেন Metronome নামে এক প্রকার যন্ত্র। 'সংগীত দর্পন'-কার দামোদর মিশ্র গীত, বাদ্য এবং নৃত্যকে মত্তগজের সঙ্গে এবং তালকে অঙ্কুশের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

"তৌর্য্যত্রিকং চ মত্তে ভস্তালে স্তস্যাঙ্কুশংবিদূ।"

পাশ্চাত্য সংগীতে তালের স্থান নির্ণয়ে দামোদর মিশ্রের এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

॥ ভারতীয় সংগীত ও বৃন্দবাদন ॥

ইংরাজী ORCHESTRA কেই আমরা ভারতীয় সংগীতে বৃন্দবাদন বলে অভিহিত করি। সাধারণভাবে একসঙ্গে একাধিক বাদ্যের পরিবেশন-কে আমরা বৃন্দবাদন বলে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একসঙ্গে একাধিক বাদ্য পরিবেশিত হলেও প্রতিটি বাদ্যের বৈশিষ্ট্য তথা স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন থাকে এবং একজন নির্দেশকের পরিচালনায় বৃন্দবাদন অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দবাদনে প্রত্যেকটি বাদককেই তাঁর সুনির্দিষ্ট ছক বাঁধা পথে অগ্রসর হতে হবে।

পাশ্চাত্য জগতেই বৃন্দবাদনের প্রথম উদ্ভব হয় এবং বিটোফেন, মোজার্ট, স্যুবার্ট প্রমুখ মনীষীদের চেষ্টায় বৃন্দবাদনের অভাবনীয় প্রসার ও উন্নতি ঘটে।

ইংরাজীতে CONCERT বলে আর একটি শব্দ আছে যেটিরও বাংলা অর্থ বৃন্দবাদন। কিন্তু CONCERT এবং ORCHESTRA-র মধ্যে পদ্ধতিগত এবং গুণগত প্রভেদ আছে। CONCERT-এর ক্ষেত্রে সবগুলি যন্ত্রকে একই সুরে বেঁধে নিয়ে সমবেতভাবে একই গৎ বাজান হয়ে থাকে এবং এর জন্য যথেষ্ট রিহার্সালের প্রয়োজন থাকলেও পরিচালকের (CONDUCTOR) প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে বৃন্দবাদনে নির্দেশকের প্রয়োজন আছে, কারণ এখানে বিভিন্ন সুরে যন্ত্রগুলি বাঁধা হয় এবং পরিচালকের নির্দেশ মত বাদকেরা চলেন। তাই CONCERT-কে বাংলায় সমবেত ঐক্যবাদন বললে ভাল হয়।

পাশ্চাত্য দেশ হতে এই বৃন্দবাদন ধীরে ধীরে ভারতীয় সংগীতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ভারতীয় সংগীতে বর্তমানে বৃন্দবাদন পাশ্চাত্যানুসারী হলেও প্রাচীন কালে যে ভারতে বৃন্দবাদন প্রচলিত ছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার মধ্যে একাধিক যন্ত্রের একত্র বাদনের প্রমান আছে।

ভারতীয় সংগীতে বৃন্দবাদন পদ্ধতি অজানা না থাকলেও এটি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও বিজ্ঞানসম্মত চর্চাভাবে সংগীতের অন্যান্য শাখার মত সমৃদ্ধ হয়নি। এর একাধিক কারণ আছে। প্রথমতঃ, ভারতীয় সংগীত অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথা ব্যক্তিপ্রধান; অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির মৌলিকত্ব প্রকাশই প্রধান হয়ে পড়ে। সুদৃঢ় বন্ধনের মধ্যে এই মৌলিকত্বের অপমৃত্যু ঘটে। রাগাদি পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ম—কানুনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও রাগালাপ, রাগবিস্তার, তান, বোলতান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির মৌলিকত্ব প্রকাশের সম্ভাবনার দ্বার সদা উন্মুখ, যেখানে শিল্পী স্বচ্ছন্দ বিহারের অনাবিল আনন্দে মশ্‌গুল, নব নব সৃষ্টির আনন্দে বিভোর। বৃন্দবাদনের কঠিন বাঁধনে মৌলিকত্ব প্রকাশের সকল দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে ভারতীয় শিল্পীর হৃদয়ে বৃন্দবাদন কোনদিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দবাদনে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট বোঝাপড়া না থাকলে বৃন্দবাদনে সাফল্য লাভ করা যায় না। কারণ বিভিন্ন বাদ্যের সম্মিলিত প্রয়োগেই এর প্রত্যাশিত রসসৃষ্টি হতে পারে, অন্যথায় রসহানি ঘটে। তৃতীয়তঃ, এই বিষয়ে উন্নতির জন্য নিতান্ত আধুনিক কাল ছাড়া পূর্ব্বে কোন সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হয়নি।

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় সংগীতে প্রায় গতিহীন বৃন্দবাদনে যে গতিসঞ্চার হয়েছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং এই বিষয়ে মাইহারের উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁকে জনকের সম্মান দিলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। কারণ তিনিই সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হয়ে "মাইহার ব্যাণ্ড" নামে একটি দল গঠন করে বৃন্দবাদন শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং তাঁর সুশিক্ষার গুণে অতি অল্পকালের মধ্যে "মাইহার ব্যাণ্ড" সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্রমে ক্রমে তিমিরবরণ, রবিশঙ্কর, শিরালী প্রভৃতি বৃন্দবাদনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন। বাংলার শ্রীসনাতন মুখার্জী রাগাদি অবলম্বনে বৃন্দবাদনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালিত করে নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

বৃন্দবাদনের উন্নতি সাধনে দিল্লী আকাশ বাণীর "রাষ্ট্রীয় বাদ্যবৃন্দ" পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য এবং এই বিভাগটির প্রচেষ্টায় আমরা রবিশঙ্কর, পান্নালাল ঘোষ প্রমুখ প্রতিভাবান পরিচালক এবং উৎকৃষ্ট রচনা উপহার পেয়েছি। বৃন্দবাদনের বর্তমান অগ্রগতির জন্য ছায়াচিত্রের অবদানও অনস্বীকার্য। কিন্তু এইসকল প্রচেষ্টা সত্বেও পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতীয় বৃন্দবাদন অনেক পিছনে পড়ে আছে। তাই এর উন্নতির জন্য সকল দিক হতে সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

॥ তবলা লহরা (Solo) বাদনে উন্নতি ॥

নৃত্য, গীত বা বাদ্যের সহযোগী যন্ত্ররূপে তবলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খোল, পখাবজ জাতীয় অবনদ্ধ বাদ্য ব্যবহৃত হলেও তবলার প্রাধান্যই সব থেকে বেশী ; তাই তবলার জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান।

লয় বা তাল প্রদর্শনই তবলার কাজ এবং তালকে সংগীতের প্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সহযোগী বাদ্য ব্যতীতও একক তবলা বাদন বিশেষ আকর্ষণীয়। এই একক বাদনকেই আমরা লহরা বা Solo বাদন বলে থাকি। কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতে কয়েকটি স্বাভাবিক সুযোগ থাকবার জন্য এর দ্বারা সহজেই জনচিত্ত জয় করা যায়। কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগ রূপায়নে অথবা লঘু সুরের একটি পৃথক উন্মাদনা বা আবেদন আছে। তবলায় ঠিক এই ধরণের সুযোগ নেই। কিন্তু সে সত্বেও এর একটি পৃথক আবেদন আছে এবং তবলার প্রয়োগকৌশলের উপর তা বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। তাই তবলা লহরা বাদন করে রসসৃষ্টি করতে হলে যথাযথ তালিম ও মুন্সিয়ানা প্রয়োজন।

বর্তমানে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে তবলা লহরা নিজের একটি স্বতন্ত্র আসন করে নিয়েছে। তাছাড়া আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র হতেও তবলা লহরা বাদন প্রায়ই প্রচারিত হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে সংগীত প্রেমী জনসাধারণ এই বাদ্যটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং এই জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে হলে লহরা বাদনকে উন্নত হতে আরও উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রথমতঃ, বিজ্ঞানসম্মত অঙ্গুলী চালনা শিখতে হবে। কারণ সঠিক অঙ্গুলী চালনা না করতে পারলে বোলগুলির দ্রুত স্পষ্ট রূপায়ন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, তবলা লহরা বাজাতে হলে সঠিক পদ্ধতিতে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে দীর্ঘকাল তালিম নেবার প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন ছন্দের কাজ, রেলা, কায়দা, পরণ ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগনৈপুন্যের উপরই লহরার সার্থকতা নির্ভর করে।

তৃতীয়তঃ, সাধারণভাবে তবলা সংগত করা অপেক্ষা লহরা বাজান অনেক কঠিন। কারণ লহরা বাজাতে হলে জ্ঞানের গভীরতা অর্থাৎ তালের হিসাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হবে।

তবলা লহরা বাদনে উন্নতির জন্য উপরি উক্ত কারণগুলি ছাড়াও সাধারণভাবে আরও কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। যেমন—

(১) একক তবলা বাদনের (Solo) প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(২) আকাশবাণী এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে প্রখ্যাত তবলা-বাদকদের একক বাদনের ব্যবস্থা করা।

(৩) পুরস্কার ইত্যাদির দ্বারা একক বাদনকে উৎসাহ দেওয়া।

কয়েকজন ভারত বিখ্যাত তবলা বাদকের প্রচেষ্টায় তবলা লহরা বাদন বর্তমানে যথেষ্ট উন্নত এবং জনপ্রিয় হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে কণ্ঠে মহারাজ, অহমেদজান থেরাকুয়া, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সামতা প্রসাদ, আল্লারাখা, কেরামৎ খাঁ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ শাস্ত্রীয় সংগীতকে লোকপ্রিয় করবার উপায় ॥

যে কোন কথাশিল্প প্রকাশেই তার শাস্ত্রের অবদান অনস্বীকার্য। শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই কথাশিল্প গড়ে ওঠে একথা সকলেরই জানা। কোন কলার ক্ষেত্রে তার শাস্ত্রের অবলুপ্তি মানেই সে কথাশিল্পেরও ধ্বংসপ্রাপ্তি। ইতিহাসে বহুবার আমরা সে নিদর্শন পেয়েছি।

শাস্ত্রকে আঁধার করে যে সংগীত তাকেই বলা হয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তিমূল হ'ল তাই তার শাস্ত্র। দেশীয় সংস্কৃতির এঁক অবিভাজ্য অঙ্গ এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। কিন্তু বর্তমান দিনে তবুও এই সঙ্গীত লোকপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে পারেনি। কোন সঙ্গীত আসরে যখনই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুরু হয়, দেখা যায়, শ্রোতাদের অধিকাংশই এই প্রকার সঙ্গীত শুনতে অনিচ্ছুক। এর কারণ প্রধানতঃ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শ্রোতাদের অজ্ঞানতা। কিন্তু গভীরে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধুর্য গায়কের দোষে অনেক সময়েই নষ্ট হ'য়ে যায়। সঙ্গীতে রঞ্জকতা গুণ না থাকায় তা শ্রোতা-মাত্রকেই আকর্ষণ করতে পারে না। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত লোকপ্রিয় না হবার এটিও একটি অন্যতম কারণ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তাই সর্ব সময়েই রঞ্জকতাগুণ সমন্বিত হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে, শ্রোতার অজ্ঞানতা থাকলেও সঙ্গীতের অপার মাধুরীমায় সকল অজ্ঞানতার ধূসর ম্লান ক্লান্তি কেটে গিয়ে বিমুগ্ধ শ্রোতার হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হবে অনাস্বাদিত রসের অপার আনন্দ।

আজকের যুগ আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর। মানুষ আজ সারা বিশ্বকে নিয়ে ভাবতে শিখেছে। জীবন এখন অনেক জটিল। তাই তার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের মাঝে সে চায় সরলতা, সহজ ভাবের আকুলতা। সে ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তত্ত্ব বহুলতাই এই সঙ্গীতে

লোকপ্রিয়তার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। অল্প সময়ের ব্যবধানে সে চায় মনোরঞ্জন। তাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে লোকপ্রিয় করে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তার ভিতরের সহজ সরল রূপটি জন মানসে অঙ্কিত করে দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, গায়ককে তার শ্রোতার রুচির প্রতি অবহিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা শ্রোতৃমণ্ডলীর রুচির উপর'ই সঙ্গীতের লোক প্রিয়তা সর্ব্বাধিক নির্ভর করে।

তৃতীয়তঃ-- সঙ্গীতকে লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে হলে শ্রোতার সেই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ সঙ্গীত শাস্ত্রে অজ্ঞান কোন ব্যক্তির পক্ষে সে সঙ্গীতের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর এবং আলোচনার মাধ্যমে জনগণের অজ্ঞানতা দূর হতে পারে। সঙ্গীতের লোকপ্রিয়তার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম উপায়।

চতুর্থতঃ— আঞ্চলিক সঙ্গীত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গূঢ় তত্ত্বগুলিকে সহজ ভাবে সকলের মাঝে বিতরণ করা যায় তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাঝে নিহিত যে সুরব্যঞ্জনা তা নিশ্চয়ই জনসাধারণ কর্তৃক আদৃত হবে।

পরিশেষে, আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাধান্য এবং চলচিত্রে এর ব্যাপক প্রয়োগ শাস্ত্রীয় সংগীতকে লোকপ্রিয় করবার সহজতর উপায়।

॥ ভারতীয় জীবনে সঙ্গীত ॥

ভারতবর্ষের সঙ্গীত অধ্যাত্ম-সাধনারই সর্বশ্রেষ্ঠ সোপান। নাদকে বলা হয়েছে পরম ব্রহ্ম।

"ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ"॥

সঙ্গীতই পরমা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আত্মীয়তার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধেছে। ভারতীয় জীবনে পূর্ণ শিক্ষা পেতে হলে সঙ্গীত একান্তই প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষ রামায়ণ

মহাভারতের দেশ। এই রামায়ণ মহাভারতের আখ্যায়িকা বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে গীত হয়ে যুগ যুগ ধরে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেছে।

ভারতীয় আদর্শ ও তার ভাবধারার সাথে সঙ্গীতের এমনই একটা নিবিড় সম্পর্ক যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভাবা যায় না।

এই অর্থে জীবন ও সঙ্গীত একই বোধিতে ধ্বনিত।

জীবনের প্রথম যেদিন আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিন আপাতভাবে হয়ত কোন সঙ্গীত শ্রুত হয়নি কিন্তু জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির কাছে অশ্রুত সঙ্গীত নিশ্চয়ই ছিল। সেইক্ষণ থেকেই জীবনের প্রতিটি অঙ্গনেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাটি ধ্বনিত হয়ে এসেছে।

ভারতীয় জীবনে এই ভাবেই এল সঙ্গীত। সঙ্গীতের মাঝে নিহিত আছে যে চিরানন্দের স্পন্দন, ভারতবর্ষ প্রথম হতেই তাকে উপলব্ধি করেছিল। তারপর থেকে তার জীবনে, ধর্মে-সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে এসে যুক্ত হল সঙ্গীতের আকৃতি।

প্রাচীন বৈদিক যুগে তাই যে সঙ্গীত অধ্যাত্ম সাধনারই প্রতিরূপ ছিল আজতা জীবনের প্রতি ক্ষেত্র পর্য্যন্তই প্রসারিত।

ভারতীয় জীবনের মাঝে একটি প্রশান্ত রূপ আছে। বিশ্বজীবনের আর কোথাও যার তুলনা মেলা ভার। যদি বলি সেই কান্তিটি এনে দিল কে? তার উত্তর পেতে দেরী হয় না। জীবনের প্রথম আবির্ভাবে সঙ্গীতকে সে নিয়েছিল বলেই ভারতীয় জীবন রূপ ও কান্তি-ময় হতে পেরেছে; কারণ সঙ্গীতের মূল কথাটি তার সুর। সুর নির্ঝরের প্রবাহে ভারতীয় জীবনের অনুভূতিতে এক অপার্থিব চেতনার সঞ্চার হল এবং সেই চেতনায় সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করল।

অচেতন থেকে চেতনার স্তরে, অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানের আলোকে অসুন্দর হতে সুন্দরের সাধনায় মগ্ন আধ্যাত্মিক ভারতের জনজীবন সংগীতের মাধ্যমেই পেয়েছে পূর্ণতার স্বাদ। তাইতো জীবনের সর্বস্তরে চলেছে সুরের সাধনা। কারণ সেই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমকে' তো সুরলোকেই অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সাম-গানের মধ্য দিয়েই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনানুভূতির আনন্দলোকে

বিচরণ করতেন। এই দেশের মাটিতেই বহু সাধক কেবলমাত্র সংগীত-কে অবলম্বন করে ঈশ্বর লাভের সাধনার দুস্তর পারাবার হেলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাইতো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অনন্য ভাষায় বলেছেন,

"যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে, শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।"

ভারতীয় জীবন ও সংগীত অবিচ্ছিন্ন। সর্ববিদ্যার মধ্যে সংগীত-কেই তাই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়ে শাস্ত্রকারেরা বলেছেন,

"ন চ বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

॥ তবলা সঙ্গতের উদ্দেশ্য ও বিধি ॥

সঙ্গীত হ'লো সুরের উচ্ছ্বাস। রবীন্দ্রনাথ সুরকে বলেছেন সে হল একটা গতি। কিন্তু সে গতির মাঝে তো চাই প্রাণের জোয়ার, তার মাঝে তো চাই সবুজ প্রাণীনতা, মুক্ত প্রাণের স্পন্দন। কে আনছে সেই প্রাণধ্বনি! সে তো সঙ্গত। সঙ্গত আনছে সেই গতির মাঝে বনমর্ম্মর ধ্বনিত প্রানোচ্ছলতা আর অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

সঙ্গীত হ'ল একটা অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ। তার মধ্যে আছে ছন্দ, তার মাঝে আছে লয়। ছন্দ ও লয়ের মণিকাঞ্চন যোগে মানুষের মনকে সঙ্গীত অনেক দূরের সুন্দরের কাছে নিয়ে যায়। আর যখন সঙ্গীতের মাঝে সঙ্গত শুনছি, তখন আর সে সুন্দরটি কেবল দূরপ্রান্তের দিকেই সীমাবদ্ধ রইল না, তার আবেদনটি চিরকালীন হ'য়ে গেল, চিরকালের সুন্দরের ঝরণায় সে তরঙ্গ তুলে গেল, চির-সুন্দরের উপলব্ধিতে দোলা দিয়ে গেল সে। দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমরা যে সুন্দরের সম্মুখীন হলাম সঙ্গত তাকে চিরকালীন করে রাখছে।

সঙ্গীত পরমানন্দের দুয়ারে গুঞ্জরণ তুলল, আর যখন সে সঙ্গী

হিসাবে পেয়ে গেল সঙ্গতকে তখন সে আনন্দবীথিকায় বয়ে গেল রসের জোয়ার। সঙ্গীত সুরকে দিল উত্তরণ, আর যখন সঙ্গত এসে জোড় বাঁধল তার সাথে, সুরের ঘটল মুক্তি।

সঙ্গীতকে সে পরিপূর্ণ করছে। মিলন ঘটাচ্ছে সে সুরের আর ছন্দের, একই সপ্রাণতায় উত্তরিত করছে সে গতি আর প্রাণময়তাকে। সেখানেই তো সংগীতের মাঝে শুনি অপার্থিব ঐকতানের মূর্চ্ছনা।

এই অপার্থিব ঐকতানের দোলা লাগানই সঙ্গতের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপার্থিব ঐকতানটি কি? সে হোল পার্থিবতা ছাড়িয়ে মিলিত স্বর, সুর, ধ্বনির যে ব্যঞ্জনা তা। অপার্থিবের যে অনুভূতি সঙ্গীত তা সৃষ্টি করলো, আর তাতে ঐকতানের আকৃতি যুক্ত করল সঙ্গত।

সঙ্গতের কাজটি প্রধানতঃ এই মিলিত স্বরগুঞ্জনের মাঝে যে চিরন্তন ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে আছে তাকে ফুটিয়ে তোলা।

দেখতে পাচ্ছি সঙ্গীতকে সে মোহনীয় রূপ দান করছে। তাই তো সঙ্গতের উদ্দেশ্য। সে সঙ্গীতের সাথে চলে তাকে দিচ্ছে রূপ।

একদিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে সঙ্গতের একটা গতি আছে। কিন্তু সুরের যে গতি তার আবেদন আলাদা। সঙ্গতের গতির মাঝে আছে প্রাণ। আর সুরের গতির মধ্যে আছে একটা মিষ্টিক অনুভূতি। সঙ্গতের কাজই হলো সেই সীমার মাঝে অসীম যে সুর তাকে প্রধান করে তোলা।

সঙ্গত যাবে সঙ্গীতের পাশে পাশে। সঙ্গীতকে পূর্ণ করে তুলতেই সে চলেছে। কিন্তু তার কাজ হ'বে না কোন সময়েই সুরকে ছাড়িয়ে যাওয়া। সঙ্গীতে সুরটিই বড় কথা। সঙ্গত তার অধীন। কিন্তু অধীনে থেকেও সে সঙ্গীতকে দেবে মুক্তি। কখনই নিজের প্রাধান্য ঘোষনায় সোচ্চার হবে না।

ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠের তবলা এবং মৃদঙ্গের নূতন শাস্ত্রীয় পাঠ্যক্রম

[১ম বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষ]

॥ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ ॥

প্রথমাংশ—যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

(১) তবলা বাঁয়া এবং মৃদঙ্গের বর্ণনা।

(২) বর্ণ উৎপাদন বিধি। তবলা—বাঁয়া এবং মৃদঙ্গের উভয়দিকে তাল, অক্ষর, পাঠাক্ষর এবং প্রত্যেকটি বর্ণের স্থায়িত্বের বর্ণনা।

(৩) বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণ।

দ্বিতীয়াংশ—তাল-বৈশিষ্ট্য।

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংজ্ঞা :—

তাল, লয়, মাত্রা, সম, খালি, ভরী, তিহাই, কলা, ক্রিয়া, অঙ্গ, বিলম্বিত লয়, মধ্য লয় এবং দ্রুত লয়, দুগুণ, চৌগুণ, আটগুণ।

(২) পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত তালগুলির (দাদরা, ঝাঁপতাল, একতাল, ত্রিতাল, আড়া চৌতাল, তিলোয়াড়া, পাঞ্জাবী, ঝুমরা, কাহারবা) ঠেকা, মাত্রাবিভাগ।

(৩) পাঠ্যক্রমের তালগুলির তাললিপি।

মধ্যমা (তৃতীয় বর্ষ)

প্রথমাংশ—যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

(১) তবলা এবং মৃদঙ্গে সুর বাঁধা।

(২) তবলা, বাঁয়া এবং মৃদঙ্গে একক অথবা সমষ্টিগতভাবে ছোট ছোট বর্ণসমষ্টির প্রয়োগ।

(৩) দক্ষিণ এবং বাম হস্তের অঙ্গুলিচালন কৌশল।

দ্বিতীয়াংশ—তালবৈশিষ্ট্য।

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা—চতুর্বিধ গ্রহ,

তিন প্রকার জাতি, লয়, তিন প্রকার কলা, মুখড়া, পরণ, লগ্গী, রেলা, লড়ী, বোল, কায়দা।

(২) তবলা ও মৃদঙ্গবাদকের গুণ ও দোষ।

(৩) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত তালগুলির (সওয়ারী গজঝম্প, মত্ততাল) ঠেকা ও মাত্রাবিভাগ।

(৪) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত তালগুলির তাললিপি।

(৫) দ্বিগুণ, চৌগুণ, তিনগুণের অর্থ এবং এই লয়কারীতে বিভিন্ন তাল লিখনের পদ্ধতি।

॥ বাদ্যবিশারদ (B. MUS) ॥

প্রথমাংশ (যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য)

(১) তবলা ও মৃদঙ্গের ইতিহাস।

(২) তবলা ও মৃদঙ্গের বিভিন্ন ঘরাণা ও বাজ।

(৩) সাথ-সংগত বাজ হতে স্বাধীনভাবে ঠেকা, গৎ, পরণ ইত্যাদি রচনা।

(৪) নিম্নলিখিতগুলির সঙ্গে তবলা ও মৃদঙ্গ সংগত :—

(ক) কণ্ঠসংগীত

(খ) যন্ত্রসংগীত

(গ) নৃত্য

(৫) তাল ছন্দের প্রয়োজনীয়তা এবং পরণে প্রয়োগ।

(৬) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংজ্ঞা :—

আবৃত্তি, ঠেকা, টুকড়া।

দ্বিতীয়াংশ (তাল-বৈশিষ্ট্য)

(১) নিম্নলিখিতগুলির সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য :—

জাতি (ছয় প্রকার), প্রস্তার, আড়ি লয়, কুয়াড়ী লয়, সোওয়াই লয়, বিয়াড়ি লয়, অতি বিলম্বিত লয়, অদ্রুত লয়, সাথসংগত, গৎ, পেশকার।

(২) ঠেকা, মাত্রা ও বিভাগাদি সহ পাঠ্যক্রমভূক্ত তাল (শিখর, রুদ্র, যতি শেখর, চিত্রা, বসন্ত, ব্রহ্ম, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, গণেশ এবং মণিতাল) লিখন।

(৩) উপরিউক্ত তালগুলির তাললিপি লিখন।

(৪) আড়ি এবং কুয়াড়ি লয়ে তাল লিখনের পদ্ধতি।

(৫) ছয়গুণ এবং আটগুণে তাল লিখনের নিয়ম।

(৬) কর্ণাটকী সপ্ত তালের বিবরণ সহ তাদের জাতি এবং লিখন পদ্ধতি।

প্রয়াগ সংগীত সমিতির (এলাহবাদ) প্রথম বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত তবলা ও মৃদঙ্গের নূতন শাস্ত্রীয় পাঠ্যক্রম

॥ প্রথম বর্ষ ॥

১। তিনতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, চারতাল, দাদরা ইত্যাদি তাল, ঠেকা, মাত্রা, বিভাগ, সম, তালি, খালি ইত্যাদি সহ ঠায় ও দ্বিগুন লয়ে লেখার অভ্যাস। টুকরা, মোহড়া ইত্যাদিরও তাল লিপি লেখার অভ্যাস।

২। নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান-লয় (বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত), মাত্রা, তাল, বিভাগ সম, তালি, খালি, ঠায়, দ্বিগুণ, চৌগুণ, ঠেকা, বোল, কায়দা, পালটা, তিহাই, মোহরা, মুখড়া, কিসিম্, টুকরা, আবর্তন। তবলার উৎপত্তির সাধারণ জ্ঞান, তবলার অঙ্গ বর্ণন, (ডাইনা বাঁয়া, গজরা, বদ্ধি বা ডোরী, পুড়ি, স্যাহী, লব, চাঁটি, গুড়রী, লকড়ী, কুঁড়ী ইত্যাদি)।

॥ দ্বিতীয়বর্ষ ॥

১। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের তালসমূহের ঠায়, দ্বিগুণ, চৌগুণ এবং উহাদের টুকরা সহ তাললিপি লেখার অভ্যাস।

দ্বিতীয়বর্ষের তাল :–রূপক, সুরফাঁকতাল (সুলতাল), তীব্রা, দীপচন্দী, কাহারবা, তিলয়াড়া।

২। পরিভাষা এবং বিষয় :—তিনগুণ, রেলা, পরণ, উঠান, তবলার দশবর্ণ এবং তাহার অভ্যাসের নিয়ম। বিষ্ণুদিগম্বর ও ভাতখণ্ডের তাল পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন। গীত এবং তাহার প্রকারের (যথা, ধ্রুবপদ, খ্যাল, তরানা, ভজন) অধ্যয়ন।

৩। সঙ্গীত সম্বন্ধে সাধারণ নিবন্ধ।

৪। বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর এবং বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনী

৫। বর্তমান কালের কোনও প্রসিদ্ধ তবলা বাদকের জীবনী।

॥ তৃতীয় বর্ষ ॥

১। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সব তালসহ তৃতীয় বর্ষের সব তালেরই ঠেকা, ঠায়, দ্বিগুণ, তিগুণ ও চৌগুণ সহ লেখার অভ্যাস এবং উহাদের পরণ, টুকরাদিও লেখার অভ্যাস।

তৃতীয় বর্ষের তাল—আড়া চৌতাল, ধামার, ধুমালী, ঝুমরা, যৎ, খেমটা।

২। পরিভাষা এবং বিষয়:

সঙ্গীত, গত্, আড়ি, বাট, পখাবজের অঙ্গের জ্ঞান। তবলা ও পখাবজের তুলনা এবং বিস্তৃত ইতিহাস, তবলা মিলানর বিধি, তবলার বিভিন্নবাজ ও জাতির অধ্যয়ন এবং চতস্র, তিস্র, মিশ্র, খণ্ড এবং সংকীর্ণের পরিভাষা।

৩। পখাবজ বিদ্যার্থীদের তবলার অঙ্গ এবং বর্ণের জ্ঞান এবং তবলা বিস্তার্থীদের পখাবজের অঙ্গ ও বর্ণের জ্ঞান।

৪। সঙ্গীত সম্বন্ধে নিবন্ধ। যথা:—তবলা বাদকের গুণ ও দোষ, ভারতীয় জীবনে সঙ্গীত, ভারতীয় বাদ্য তথা তবলা।

॥ চতুর্থ বর্ষ ॥

১। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষের সব তাল সহ চতুর্থ বর্ষের তালগুলির ঠেকা ঠায়, দ্বিগুণ, তিগুণ, চৌগুণ, আড়, কুয়াড় লয়কারীর সহিত তাল লিপি লেখার অভ্যাস। বিভিন্ন প্রকার কায়দা, টুকরা, পরণ এবং ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর উভয়ের তাললিপি লেখার সম্পূর্ণ জ্ঞান। চতুর্থ বর্ষের তাল:—পঞ্চম সওয়ারী (১৫ মাত্রার), টপ্পা, আদ্ধা, পাঞ্জাবী, গজঝম্প, মত্ততাল।

২। পূর্ব্বেকার বর্ষগুলির সব পারিভাষিক শব্দের সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং তাহাদের ক্রিয়াত্মক মহত্ব, তালের দশ প্রাণ এবং ভারতীয় সঙ্গীতে তাহাদের মহত্ব। পেশকার এবং তাহার প্রয়োগ। সাথসঙ্গত, লগ্গী, লড়ী, ফরমাইশী চক্রদার পরণ, চক্রদার টুকরা ইত্যাদির জ্ঞান। বিভিন্ন মাত্রা থেকে তিহাই প্রস্তুত করে তাললিপি লেখার জ্ঞান।

৩। গণিত দ্বারা বিভিন্ন তালের দ্বিগুণ, তিগুণ, আড় এবং কুয়াড় আরম্ভ করবার স্থান দেখিয়ে দেওয়ার জ্ঞান এবং তাহার তাল লিপি লেখার অভ্যাস।

৪। সমান মাত্রা তালের মধ্যে তুলনমূলক অধ্যয়ন।

৫। সঙ্গীত সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর নিবন্ধ লেখার দক্ষতা।

৬। জীবনী :—বিষ্ণু দিগম্বর পুলস্কর, বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে, তানসেন, আমীর খুসরো, আহম্মদজান থিরকুয়া, কণ্ঠে মহারাজ।

৭। বিষ্ণু দিগম্বর এবং ভাতখণ্ডেজীর তাললিপি পদ্ধতির সূক্ষ্ম এবং তুলনা মূলক অধ্যয়ন এবং তাহার গুণ ও দোষ বিচার।

॥ পঞ্চম বর্ষ ॥

১। তালগুলির ঠেকাসহ সর্বপ্রকার লয়কারিতে তাল লিপি লেখার অভ্যাস। টুকরাদিরও তাললিপি লেখা।

পঞ্চমবর্ষের তালাদি :—শিখর, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, পস্তো, ফরোদস্ত।

২। বিভিন্ন মাত্রা থেকে নূতন নূতন টুকরা প্রস্তুত করণের অভ্যাস। গাণিতিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন লয়কারির প্রারম্ভিক স্থান নির্দেশ করার অভ্যাস।

৩। পরিভাষা ও বিষয় :—কুয়াড়, বিয়াড়, ফরমাইশী চীজ, লোম বিলোম, সওয়াগুণ, পৌনগুণ, দক্ষিণীতালের তাললিপি, বিভিন্ন ভারতীয় ঘন বাদ্য এবং তাহার প্রয়োগ, তবলা এবং পখাবজের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

৪। প্রবন্ধ লিখনের অভ্যাস, যেমন তবলা সঙ্গতের উদ্দেশ্য এবং বিধি, তবলা বাদকের গুণ দোষ।

৫। নিবন্ধ লেখার জ্ঞান, এবং উচ্চধরণের তবলাও মৃদঙ্গবাদকের বাদন শৈলী ও তাহাদের গুণ দোষের আলোচনা।

৬। তাললিপির তুলনাত্মক অধ্যয়ন এবং তাহার দোষ দূর করবার উপায়।

৭। সমান মাত্রাতালের মধ্যে তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

॥ ষষ্ঠবর্ষ ॥

প্রথম প্রশ্নপত্র

১। তবলার বিভিন্ন ঘরাণা ও বাজের জন্ম এবং তাহার বিকাশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, (লখ্‌নৌ আদি) এবং উহাদের বিশেষত্বের সূক্ষ্ম অধ্যয়ন, পখাবজ ও তবলার বোলের পার্থক্য। "সোলো', এবং "সাথ" বাজের পার্থক্য এবং উভয় বিধির বিস্তৃতবর্ণনা, সঙ্গত করবার পদ্ধতি, ঘন বাদ্যের উন্নতির উপায়, প্রখ্যাত তবলিয়া এবং তাঁহাদের বিশেষত্ব, স্বর এবং লয়ের সম্বন্ধ, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালের স্থান এবং তাহার সাধন বিধি। তাললিপির জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তাল সম্বন্ধী বাদ্যের অধ্যয়ন।

ষষ্ঠবর্ষের তালাদি—কৈদ, ফরদোস্ত, কুম্ভ, বসন্ত, সবারী (১৫ মাত্রা), পস্তো।

২। তবলা 'সোলোর' উন্নতির উপায়। উচ্চ শিক্ষাতে সঙ্গীতের স্থান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে লোকপ্রিয় করবার উপায়। সঙ্গীতে লয় তথা তালের মহত্ব।

৩। তবলা-বাদকদের জীবনী ও তাঁহাদের বাদন শৈলীর তুলনাত্মক আলোচনা।

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

(ক্রিয়াত্মক সম্বন্ধী)

১। পূর্ববর্ষকার সব কয়টি তালই দুইটি তাললিপিতে লিখনের জ্ঞান।

২। তালের তুলনাত্মক আলোচনা।

৩। তালগুলিকে বিভিন্ন লয়কারীতে লেখার অভ্যাস।

৪। কর্ণাটক তাললিপি অনুসারে নিজ নিজ পাঠ্যক্রমভুক্ত তালগুলি লেখার জ্ঞান।

৫। পাশ্চাত্য তাল লিপির জ্ঞান।

প্রাচীন কলাকেন্দ্রের (চণ্ডীগড়) প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত তবলা ও মৃদঙ্গের শাস্ত্রীয় অংশের পাঠক্রম

॥ প্রথম বর্ষ ॥

১। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দের জ্ঞান:—
লয় (বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত), মাত্রা, তাল, বিভাগ, সম, তালি, খালি, ঠায়, দ্বিগুণ, ঠেকা ও আবর্তন।

২। তবলা ও পাখোয়াজের ডাহিনা ও বাঁয়ার কোন কোন স্থানে আঘাত করিয়া কোন কোন একাক্ষর শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ।

৩। তবলার উৎপত্তির সাধারণ জ্ঞান। ডাহিনা ও বাঁয়ার অঙ্গ বর্ণনা। ডাহিনা ও বাঁয়া কোন কোন দ্রব্যের সাহায্যে নির্মিত হইতে পারে।

৪। এই বর্ষের তালগুলির ঠেকা, ঠায় ও দ্বিগুণে লেখা।

॥ দ্বিতীয় বর্ষ ॥

১। তবলা ও পাখোয়াজের দাহিনা ও বাঁয়ার কোন কোন স্থানে আঘাত করিয়া কোন কোন সংযুক্ত অক্ষর উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ।

২। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দের অধ্যয়ন:—
বোল, কায়দা, পাল্টা, তেহাই, মোহরা, মুখড়া, টুকরা, চৌগুণ, রেলা, পেশকার, উঠান এবং পরণ।

৩। ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বরের তাল পদ্ধতির জ্ঞান ও বিষ্ণু দিগম্বর পদ্ধতিতে ঠেকা লেখা।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের তালের ঠেকা দ্বিগুন, তিনগুণ ও চৌগুণে লেখা।

৫। জীবনী: আনোখেলাল মিশ্র, কণ্ঠে মহারাজ।

॥ তৃতীয় বর্ষ ॥

১। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দগুলির অধ্যয়ন :—
বেলা, লগ্‌গী, লড়ী, আড়, গৎ, বাঁট, চক্রদার, পরণ, গ্রহ ও তার চার প্রকার, পেশকার, তবলার দশবর্ণ, দমদার তেহাই ও বেদমদার তেহাই।

২। সাধারণ গায়ন ও বাদন শৈলীর জ্ঞান, যেমন ধ্রুপদ, ধামার, ঠুংরী, খেয়াল, মজিদখানি এবং রজাখানী।

৩। সমান মাত্রার তালগুলির তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৪। তবলা ও পাখোয়াজের বিস্তারিত তুলনাত্মক ইতিহাস। তবলা সুরে মেলানোর প্রক্রিয়া। তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের গুণ ও দোষ।

৫। ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতির অধ্যয়ন। এই দুই পদ্ধতিতে কায়দা, টুকরা, পরণ এবং পেশকার লিখিবার অভ্যাস।

৬। তাল এবং তার দশ প্রাণের অধ্যয়ন। বর্তমান বৎসরের এবং গত সমস্ত বৎসরের পাঠক্রমে লিখিত তালগুলির ঠেকার ঠায়, দুগুণ এবং আড় লিখিবার অভ্যাস।

৭। আহমদজান থিরকুয়া, কেরামৎ খাঁ, হীরেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি বাদকদের প্রসিদ্ধির কারণ।

৮। সংগীত সম্বন্ধীয় নিবন্ধ।

॥ চতুর্থ বর্ষ ॥

১। এই বর্ষের তালগুলিন ঠেকার সমস্ত লয়কারী তাললিপিতে (Notation of Tal) লেখা। এই সব তালের পরণ, টুকরা, পেশকার ইত্যাদি তাললিপিতে লিখিবার অভ্যাস।

২। তবলার বিভিন্ন ঘরাণার বাদন ভঙ্গীর অধ্যয়ন। বর্তমান প্রসিদ্ধ তবলা বাদকদের নাম ও সংগীতে তাহাদের অবদান।
সমান তালগুলির তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৩। ভাতখণ্ডে এবং বিষ্ণুদিগম্বর তাল পদ্ধতির চিহ্নের অধ্যয়ন এবং তাহাদের সংশোধনের উপায়।

৪। ভারতীয় ঘন বাদ্যের অধ্যয়ন এবং সংগীতে তাহাদের প্রয়োগ।

৫। কর্ণাটক তালপদ্ধতির অধ্যয়ন।

৬। তাল, সংগত এবং লয়কারী সম্বন্ধে রচনা লিখন।

॥ পঞ্চম বর্ষ ॥

॥ প্রথম প্রশ্ন পত্র ॥

১। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দের অধ্যয়ন:—
লোম, বিলোম, আড়, বিয়াড়, দুপল্লী, তিপল্লী, অতীত, অনাঘাত, সম, বিষম, ফর্‌মাইসী, পরণ, ক্রত, অনুক্রত, কুসবী, অতাই।

২। তবলা এবং পাখোয়াজের পূর্ণ ইতিহাস। দুটিতে তুলনাত্মক অধ্যয়ন। দুই বাদ্যযন্ত্রের পার্থক্য বর্ণন।

৩। হিন্দুস্থানী এবং কর্ণাটক তাল পদ্ধতির বিস্তারি তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

৪। হিন্দুস্থানে কোন কোন প্রকারের ঘন বাদ্যযন্ত্র (Percussion Instrument) ব্যবহৃত হয়।

৫। লয় ও লয়কারীর পার্থক্যের জ্ঞান।

॥ দ্বিতীয় প্রশ্ন পত্র ॥

১। এই বর্ষের তালগুলির ঠেকার সমস্ত লয়কারীতে লিখিবার অভ্যাস। পরণ, টুকরা, কায়দা আদিকে তালবদ্ধ (Notation) করিয়া লিখিবার অভ্যাস।

২। কর্ণাটক ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে তাললিপিতে নিজের পাঠ্যক্রমের তালগুলিকে লিখিবার জ্ঞান।

৩। তবলা ও মৃদঙ্গের বাদনভঙ্গীর পার্থক্য।

৪। জীবনী:—আবিদ হোসেন, কণ্ঠে মহারাজ।